মাসিক
আল-আবরার
The Monthly AL-ABRAR
রেজি. নং-১৪৫ বর্ষ-৩, সংখ্যা-১১

مجلة شهرية دعوية فكرية ثقافية اسلامية

জানুয়ারি ২০১৫ ইং, রবিউল আওয়াল ১৪৩৬ হি., পৌষ ১৪২১ বাং

ربيع الاول ١٤٣٦ يناير ٢٠١٤م

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক
ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আবদুর রহমান (দামাত বারাকাতুহুম)
প্রধান সম্পাদক
মুফতী আরশাদ রহমানী
সম্পাদক
মুফতী কিফায়াতুল্লাহ শফিক
নির্বাহী সম্পাদক
মাওলানা রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী
সহকারী সম্পাদক
মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন
বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি
মুহাম্মদ হাশেম
সার্কুলেশন ম্যানেজার
হাফেজ আখতার হোসাইন

সম্পাদনা বিষয়ক উপদেষ্টা
মুফতী এনামুল হক কাসেমী
মুফতী মুহাম্মদ সুহাইল
মুফতী আব্দুস সালাম
মাওলানা হারুন
মুফতী রফীকুল ইসলাম আল-মাদানী

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ২
পবিত্র কালামুল্লাহ থেকে :..... ৩
পবিত্র সুন্নাহ থেকে :
'ফাজায়েলে আমাল' নিয়ে এত বিভ্রান্তি কেন ৫
হযরত হারদূয়ী (রহ.)-এর অমূল্য বাণী ১৪
মাওয়ায়েযে ফকীহুল মিল্লাত :
মীলাদুন্নবী (সা.) পালনের সঠিক পদ্ধতি..... ১৫
"সিরাতে মুস্তাকীম" বা সরলপথ :
খতমে নবুওয়াত ও কাদিয়ানী মতবাদ..... ১৭
মাওলানা মুফতী মনসূরুল হক
মুদ্রার তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ও শরয়ী বিধান-১২..... ২৬
মাওলানা আনোয়ার হোসাইন
লা-মাযহাবী ফিতনা : বাস্তবতা ও আমাদের করণীয়-৯..... ৩১
সায়্যিদ মুফতী মাসূম সাকিব ফয়জাবাদী কাসেমী
মাযহাব প্রসঙ্গে ডা. জাকির নায়েকের অপপ্রচার ৮..... ৩৭
মাও. ইজহারুল ইসলাম আলকাওসারী
জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান ৪৩
মলফূজাতে আকাবের ৪৬
আবু নাঈম মুফতী মুঈনুদ্দীন

বিনিময় : ২০ (বিশ) টাকা মাত্র
প্রচার সংখ্যা : ১০,০০০ (দশ হাজার)

যোগাযোগ

সম্পাদনা দফতর
মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ
ব্লক-ডি, ফকীহুল মিল্লাত সরণি, বসুন্ধরা আ/এ, ঢাকা।
ফোন : ০২-৮৪০২০৯১, ০২-৮৮৪৫১৩৮
ই-মেইল : monthlyalabrar@gmail.com
ওয়েব : www.monthlyalabrar.com
www.monthlyalabrar.wordpress.com
www.facebook.com/মাসিক-আল-আবরার

মোবাইল: প্রধান সম্পাদক: ০১৮১৯৪৬৯৬৬৭, সম্পাদক:০১৮১৭০০৯৩৮৩, নির্বাহী সম্পাদক: ০১১৯১২৭০১৪০ সহকারী সম্পাদক: ০১৮৫৫৩৪৩৪৯৯
বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি: ০১৭১১৮০৩৪০৯, সার্কুলেশন ম্যানেজার : ০১১৯১৯১১২২৪

সম্পাদকীয়

নবীজির (সা.) উত্তম আদর্শই হোক আমাদের একমাত্র জীবন পাথেয়

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেন–

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

নিশ্চয়ই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ। (আহযাব ৩৩)

ইসলামী শরীয়ত মানুষের একটি সামগ্রীক জীবন পদ্ধতি। যা মুসলমানের সুস্থ জীবন গঠনে উত্তম আদর্শ গ্রহণে অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছে। একটি শান্তিময়, স্থিতিশীল সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় উত্তম আদর্শই হলো মূল উপকরণ। উত্তম আদর্শের একটি আবশ্যকীয় অংশ শিষ্টাচার ও উত্তম চরিত্র। যেহেতু ইসলাম মানুষের ইহ-পারলৌকিক জীবনে শান্তি ও সফলতার গ্যারান্টি, তাই উত্তম চরিত্র ইসলামে একটি আবশ্যকীয় বিষয়। এ কারণে ইসলাম আক্বীদা ও আখলাকের মাঝে সম্পর্ক স্থাপন করে দিয়েছে। যেমন নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন,

اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا

"মুমিনদের মধ্যে পরিপূর্ণ ঈমানদার হচ্ছে সে ব্যক্তি, যে তাদের মধ্যে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী।" [আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী]

উত্তম চরিত্র হচ্ছে ঈমানের প্রমাণবাহী ও এর প্রতিফলন। চরিত্র ব্যতীত ঈমান প্রতিফলিত হয় না বরং নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে প্রেরণের অন্যতম মহান উদ্দেশ্য হচ্ছে, চরিত্রের উত্তম দিকসমূহ পরিপূর্ণ করে দেয়া। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন,

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

"আমি তো চরিত্রের উত্তম দিকসমূহ পরিপূর্ণ করে দিতে প্রেরিত হয়েছি।" (হাদীসটি ইমাম আহমাদ রহ. মুসনাদে ও ইমাম বুখারী রহ. আদাবুল মুফরাদে বর্ণনা করেছেন)

এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা উত্তম ও সুন্দরতম চরিত্রের দ্বারা তাঁর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রশংসা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ

"নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত।" (সূরা আল, কালাম : ৪)

একজন মুসলমানের আল্লাহর সাথে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে, অন্য মানুষের সাথে, এমনকি নিজের সাথে কী ধরনের আচরণ করা উচিত, ইসলাম তারই এক উজ্জ্বল বাস্তবতার নাম। যখনই একজন মুসলমান বাস্তবে ইসলামী চরিত্রের অনুসরণ করে, তখনই সে অভীষ্ট পরিপূর্ণতার অতি নিকটে পৌঁছে যায়, যা তাকে আরো বেশি আল্লাহর নৈকট্য লাভ ও উচ্চ মর্যাদার সোপানে উন্নীত হতে সহযোগিতা করে। পক্ষান্তরে, যখনই একজন মুসলমান ইসলামের চরিত্র ও শিষ্টাচার হতে দূরে সরে যায়, সে বাস্তবে ইসলামের প্রকৃত প্রাণচাঞ্চল্য, নিয়ম-নীতির ভিত্তি হতে দূরে সরে যায়। সে যেন একজন যান্ত্রিক মানুষে পরিণত হয়। যার না কোনো অনুভূতি আছে, না আছে আত্মা।

ইসলামে ইবাদতসমূহও চরিত্রের সাথে কঠোরভাবে সংযুক্ত। প্রতিটি ইবাদতে বিভিন্নভাবে উত্তম চরিত্রের প্রতিফলন ঘটে। যেমন নামায, অশ্লীল কাজ হতে নিষেধ করে। (আনকাবূত ৪৫) রোযা তাকওয়ার দিকে নিয়ে যায়। (বাকারা ১৮৩) যাকাত অন্তরকে পবিত্র এবং আত্মাকে পরিমার্জিত করে। (তাওবা ১০৩) হজ পাপপঙ্কিলতা থেকে বেঁচে থাকার একটি বাস্তব প্রশিক্ষণশালা। (বাকারা ১৯৭)

এমনিভাবে মুসলমানের বাস্তব জীবনে সত্যবাদিতা, আমানতদারী, অঙ্গীকার পূর্ণ করা, বিনয়, পরস্পর সদ্ব্যবহার, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা, প্রতিবেশীর সাথে সুন্দরতম ব্যবহার, মেহমানের আতিথেয়তা, দান ও বদান্যতা, ধৈর্য-সহিষ্ণুতা, পরস্পর সমঝোতা-সংশোধন, লজ্জাবোধ, দয়া ও করুণা, ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতা, চারিত্রিক পবিত্রতা ইত্যাদি মৌলিক গুণাবলি অর্জনের যেমন নির্দেশ রয়েছে, তেমনি এসবের সুষ্ঠু চর্চায় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাস্তব প্রশিক্ষণও রয়েছে। সাথে সাথে এমন সব বিষয় বর্জন করার নির্দেশ রয়েছে, যার কারণে সমাজে অশান্তি সৃষ্টি হয় এবং অস্থিতিশীলতা ধেয়ে আসে। যেমন,

অহংকার, আত্মপ্রীতি, কঠোরতা, লোভ, কৃপণতা, রিয়া, প্রতিহিংসা, বৈরিতা, ঈর্ষা, অন্যায়, অবিচার, অনাচার ইত্যাদি। এসব বিষয় হলো মানব প্রকৃতির সাথেই সংশ্লিষ্ট। সুতরাং অনুশীলনাবশ্যক বিষয়গুলোর চর্চা না হলে এবং বর্জনীয় বিষয়গুলো পরিত্যাগ করা না হলে মানবতার উন্নতি সাধিত হওয়ার কোনোই সম্ভাবনা থাকে না। মানবতার উন্নতি না হলে সুষ্ঠু ও কল্যাণময় সমাজ গঠনের প্রক্রিয়া কোনো সময় কোনোভাবে সফলকাম হওয়ার নয়।

আরেকটি বাস্তবতা হলো, একমাত্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আদর্শ ব্যতিরেকে দুনিয়ার কোনো আদর্শেই এসব বিষয়ের পরিপূর্ণ প্রতিফলন নেই।

এ কারণেই একমাত্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আদর্শের বাস্তবায়ন ছাড়া দুনিয়া ও আখেরাতে শান্তি সফলতা কামনা করা নিতান্তই অযৌক্তিক।

তবে এসব বিষয় সর্বপ্রথম মুসলমানদের মাঝেই পরিপূর্ণরূপে চর্চা হওয়া আবশ্যক। মুসলিম উম্মাহের বাস্তব জীবনে এসব আদর্শের বাস্তব প্রতিফলন দেখা গেলে প্রতিটি জাতিই এর প্রতি ধাবিত হবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

আরশাদ রহমানী
ঢাকা।
২২/১২/২০১৪

পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফ থেকে

উচ্চতর তাফসীর গবেষণা বিভাগ :
মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

بسم الله الرحمن الرحيم

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ (١) وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ (٢) الَّذِى أَنْقَضَ ظَهْرَكَ (٣) وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (٤)

"আমি তোমার বক্ষ তোমার কল্যাণে উন্মুক্ত করে দিইনি? আমি তোমা হতে অপসারণ করেছি তোমার সেই ভার, যা তোমার পৃষ্ঠকে অবনমিত করেছি এবং আমি তোমার খ্যাতিকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছি।

ورفعنا لك ذكرك : আমি তোমার জন্য তোমার খ্যাতি সমুন্নত করেছি। হযরত মুজাহিদ (রহ.) বলেন, এর ভাবার্থ হলো, যেখানে আমার (আল্লাহর) আলোচনা হবে, সেখানে তোমারও আলোচনা হবে। যেমন–

لا اله الا الله محمد رسول الله

আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল।

اشهد ان لا اله الاالله وان محمد ا رسول الله

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল।

হযরত কাতাদা (রা.) বলেন যে, এর ভাবার্থ হলো, দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহ তা'আলা প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আলোচনা বুলন্দ করেছেন। কোনো খতীব, কোনো বক্তা, কোনো বাগ্মী এবং কোনো নামাযী এমন নেই, যিনি আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষণা দেওয়ার সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর রিসালাতের কথা উচ্চারণ করেন না। ইমাম ইবনে জারীর (রহ.) বর্ণনা করেছেন, হযরত জিবরাঈল (আ.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে এসে বলেন, আমার এবং আপনার প্রতিপালক আপনার আলোচনাকে কী করে সমুন্নত করবেন, তা তিনি জানতে চান।" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উত্তরে বলেন, সেটা আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) জানিয়ে দেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আমার কথা যখন আলোচনা করা হবে, তখন আমার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কথাও আলোচিত হবে।

মুসনাদে ইবনে আবী হাতিমে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আমি আমার প্রতিপালককে একটি প্রশ্ন করেছি, কিন্তু প্রশ্নটি না করাই ভালো ছিল। প্রশ্নটি হলো, হে আল্লাহ! আমার পূর্ববর্তী কোনো নবীর জন্য কি আপনি বাতাসকে তাঁবেদার বানিয়েছিলেন? কারো হাতে মৃতকে জীবিত করিয়েছেন? আল্লাহ তা'আলা জবাবে বলেন, আমি কি তোমাকে ইয়াতীম পেয়ে আশ্রয় দিইনি? আমি জবাবে বললাম : হ্যাঁ, অবশ্যই দিয়েছেন। আল্লাহ পাক আবার প্রশ্ন করেন, আমি কি তোমাকে পথভোলা অবস্থায় পেয়েও পথনির্দেশ প্রদান করিনি? উত্তর দিলাম হ্যাঁ, অবশ্যই করেছেন। আল্লাহ পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, আমি কি তোমাকে দরিদ্রাবস্থায় পেয়েও বিত্তশালী করিনি? আমি জবাবে বললাম, হ্যাঁ। হে আমার প্রতিপালক! অবশ্যই করেছেন। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, আমি কি তোমার কল্যাণে তোমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিইনি? উত্তর দিলাম, হে আমার প্রতিপালক হ্যাঁ, অবশ্যই দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা পুনরায় প্রশ্ন করলেন, আমি কি তোমার খ্যাতিকে উচ্চ মর্যাদা দান করিনি? আমি জবাবে বললাম, হ্যাঁ, হে আমার প্রতিপালক, অবশ্যই করেছেন।

হযরত আবু নাঈম লিখিত দালাইলুন নুবুওয়াহ নামক গ্রন্থে হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, আমার মহান প্রতিপালক আমাকে আকাশ ও জমীনের কাজের ব্যাপারে যে নির্দেশ দিয়েছেন, সেই কাজ হতে অব্যাহতি লাভ করার পর আমি তাঁকে বললাম, হে আমার প্রতিপালক! আমার পূর্বে যত নবী গত হয়েছেন, তাঁদের সবাইকে আপনি সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন। হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে বন্ধু বানিয়েছেন, হযরত মূসা (আ.)-কে কালীম বানিয়েছেন, অর্থাৎ তাঁর সাথে বাক্যবিনিময় করেছেন, হযরত দাউদ (আ.)-এর জন্য পাহাড়কে বিদীর্ণ করেছেন, হযরত সুলাইমান (আ.)-এর জন্য বাতাস এবং জিনকে অনুগত করেছেন, হযরত ঈসা (আ.)-এর হাতে মৃতকে জীবন দান করেছেন। সুতরাং আমার জন্য কী করেছেন? আল্লাহ তা'আলা জবাবে বলেন : আমি কি তোমাকে তাদের সবার চেয়ে উত্তম জিনিস প্রদান করিনি? আমার যিকির বা আলোচনার সাথে তোমার আলোচনাও করা হয়ে থাকে এবং আমি তোমার উম্মতের বক্ষকে এমন করে দিয়েছি যে, তারা প্রকাশ্যে কোরআন পাঠ করে। এটা আমি পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যে কাউকেই দিইনি। আর আমি তোমাকে আরশের ধনাগার হতে ধন দিয়েছি। সেই ধন হলো,

لاحول ولاقوة الا بالله العلى العظيم অর্থাৎ পাপকার্য হতে

ফিরবার এবং ভালো কাজ করবার ক্ষমতা সমুন্নত ও মহান আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কারো নেই।"

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও হযরত মুজাহিদ (রহ.) বলেন, এখানে আযানকে বোঝানো হয়েছে। যেমন–হযরত হাসসান ইবনে সাবিতের (রা.) নিম্নের কবিতায় রয়েছে,

اغر عليه للنبوة خاتم☆ من الله نور يلوح ويشهد

وضم الاله اسم النبى الى اسمه☆ اذا قال فى الخمس المؤذن اشهد

وشق له من اسمه ليجله☆ فذوا العرش محمود وهذا محمد

অর্থাৎ "আল্লাহ তা'আলা মুহরে নবুওয়াতকে নিজের নিকটের একটি নূর বানিয়ে তাঁর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওপর চমকিত করেছেন, যা তাঁর রেসালাতের সাক্ষ্য দেয়। আল্লাহ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর নামকে নিজের নামের সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন, যখন মুআযযিন পাঁচবার (পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের মধ্যে) আশহাদু (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি) বলে। আর আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নামকে স্বীয় নাম হতে বের করেছেন। সুতরাং আরশের মালিক (আল্লাহ) হলেন মাহমূদ এবং ইনি নবী করীম (সা.) হলেন মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)।" অন্যেরা বলেন যে, পূর্ববর্তী এবং পরবর্তীদের মধ্যে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণের দিনে আল্লাহ তা'আলা অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, তাঁরা তাঁর প্রিয় নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওপর বিশ্বাস স্থাপন করবেন এবং নিজ নিজ উম্মতকেও বিশ্বাস স্থাপনের নির্দেশ দেবেন। তাছাড়া প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উম্মতের মধ্যেও আল্লাহ তা'আলা তাঁর আলোচনার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন আল্লাহর আলোচনার সাথে সাথে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এরও আলোচনা করে। সরসরি (রহ.) একটি চমৎকার কথা বলেছেন। তিনি বলেন–

لايصح الاذان فى الفرض الا ☆ باسمه العذب فى الفم الرضى

الم ترانا لا يصح اذاننا☆ ولا فرضنا ان لم نكرره فيهما

অর্থাৎ "আল্লাহ প্রিয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মিষ্টি নাম পছন্দনীয় এবং সুন্দর মুখ থেকে উচ্চারিত হওয়ার পূর্বে আমাদের কর্তব্যজনিত আযান বিশুদ্ধ হয় না। তুমি কি দেখো না যে, আমাদের আযান এবং আমাদের কর্তব্য বিশুদ্ধ হয় না, যতক্ষণ না বারবার নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নাম উচ্চারিত হয়।

আত্মশুদ্ধির পথে মাসিক আল-আবরারের স্বার্থক দিকনির্দেশনা অব্যাহত থাকুক

টাইলস এবং সেনিটারী সামগ্রীর বিশ্বস্ত ও ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান

Importers & General Marchant of Sanitary Goods & Bath Room Fittings

J.K SANITARY

25/2 Bir Uttam C.R. Dutta RoadHatirpool, Dhaka, Bangladesh.
E-mail: taosif07@gmail.com
Tel: 0088-029662424, Mobile: 01675303592, 01711527232

Rainbow Tiles

2, Link Road, Nurzahan Tower, Shop No: 0980/20 Mymansing Road, Dhaka, Bangladesh
Tel : 0088-02-9612039, Mobile : 01674622744, 01611527232
E-mail: taosif07@gmail.com

বি.দ্র. মসজিদ মাদরাসার ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ থাকবে

উচ্চতর হাদীস গবেষণা বিভাগ : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

কোরআন মজীদের পর সর্বাধিক পঠিত কিতাব

ফাজায়েলে আমাল নিয়ে এত বিভ্রান্তি কেন

'ফাজায়েলে আমাল' পরিচিতি

বর্তমান দুনিয়ায় পবিত্র কোরআনের পর সর্বাধিক পঠিত এবং সর্বাধিক ভাষায় অনূদিত গ্রন্থ 'ফাজায়েলে আমাল'। বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের মাঝে ব্যাপক আকারে দ্বীনি আমলের প্রেরণা সৃষ্টি, দুনিয়ামুখী মুসলমানদের দ্বীনমুখীকরণ এবং আল্লাহ ও রাসূল (সা.) বিমুখ মানুষকে আল্লাহ ও রাসূল (সা.)-এর তরীকামুখী করার ক্ষেত্রে এই গ্রন্থের অত্যধিক ভূমিকা একটি অনস্বীকার্য বাস্তবতা।

তাবলীগি জামাআত

এটি মুসলিম উম্মাহর এমন একটি দাওয়াতী কাফেলা যারা নিঃস্বার্থ, নিরপেক্ষ, সুশৃঙ্খল ও নিরলষভাবে কোরআন ও সুন্নাহর বাণী নিয়ে বিশ্বের প্রতিটি জনপদে অবিরাম কাজ করে যাচ্ছে। এর বরকতে সিরাতে মুস্তাকীমের পথে আসছে বিশ্বের কোটি কোটি মুসলমান।

তাবলীগ এবং সাধারণ মুসলমানের দৈনন্দিন নেসাব

ফাজায়েলে আমাল গ্রন্থটি তাবলীগ জামাআতের দৈনন্দিন নেসাব হিসেবে যেমন বিশ্বের প্রায় মসজিদে পঠিত হয়, তেমনি এর মাধ্যমে হেদায়াতপ্রাপ্তরা কিতাবটির অলৌকিক আকর্ষণ এবং আল্লাহর কাছে এর মকবুলিয়্যাত আঁচ করতে পেরে নিজের পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব ও আপনজনের হেদায়াতের আশায় ঘরে ঘরেও কিতাবটির পঠন-পাঠন চালু রেখেছেন।

লেখক

কিতাবটির লেখক বিখ্যাত হাদীস বিশারদ শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া সাহেব কান্ধভলী (রহ.)। তাঁর এটুকু পরিচয়ই যথেষ্ট যে, নিকট অতীতে যে সকল বড় বড় মুহাদ্দিস হাদীসের সঠিক খেদমাত আঞ্জাম দিয়েছেন, তাঁদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উস্তাদ তিনি। তাঁর অভূতপূর্ব হাদীসের খেদমাত-লিখিত শরাহ তথা হাদীসের ব্যাখ্যা গ্রন্থসহ বিভিন্ন কিতাব এখনও সারা দুনিয়ায় বিভিন্ন দরসেগাহে সাক্ষ্য হিসেবে রয়েছে এবং থাকবে ইনশাআল্লাহ।

আলোচ্য কিতাবে কী আছে

শুধু আলোচ্য কিতাব তথা তাঁর লিখিত কয়েকটি কিতাবের সংযুক্তরূপ 'ফাজায়েলে আমাল' গ্রন্থটি গভীর দৃষ্টিতে পাঠ করলে অনুমান করা যায় ছোট-বড় কত হাজার কিতাব হযরত শায়খুল হাদীস (রহ.)-এর মুতালাআধীন ছিল। কত শত শত কিতাবের নির্যাস এই ফাজায়েলে আমাল। আরো প্রতীয়মান হবে পবিত্র কোরআনসহ কতসংখ্যক হাদীস, তাফসীর ও সিয়ার গ্রন্থের নূরের সংমিশ্রণ এতে রয়েছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা, যেহেতু এই কিতাবকে সারা দুনিয়ার মুসলমানদের জন্য মকবুলে আম করে দেবেন তাই তাঁর প্রেরিত নবী রাসূল এবং সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তবেতাবেঈন মোট কথা তাঁর অগণিত মুকাররাব বান্দার কিছু না কিছু নূর এই কিতাবে সন্নিবিষ্ট করে দিয়েছেন। সে কারণে দেখা যায় কিতাবটিতে একদিকে পবিত্র কোরআনের আয়াত, হাদীসে রাসূল, বড় বড় মনীষীদের হাদীসের ব্যাখ্যা, বিশ্ববিখ্যাত মুফাসসিরগণের তাফসীর সন্নিবিষ্ট হয়েছে, অন্যদিকে নবী রাসূলগণের বিভিন্ন সত্য ঘটনাবলি, সাহাবায়ে কেরামের হেকায়াত, তাবেঈন তবেতাবেঈন, সলফে সালেহীন এবং ওলী বুযুর্গদের কাহিনী সংকলন করা হয়েছ এতে। যা শুধু ঈমানকে তাজাই করে না বরং বেঈমানকেও ঈমানদার বানাতে সাহায্য করে।

কিছু পরিতাপ কিছু শুকরিয়া

কিন্তু পরিতাপ হয় তাদের জন্য, যারা বুঝে হোক, না বুঝে হোক, পরিকল্পিতভাবে হোক বা অজ্ঞাতসারে এই কিতাব তথা 'ফাজায়েলে আমাল' সম্পর্কে বিভিন্ন উদ্ভট, মিথ্যা, প্রতারণামূলক বানানো অভিযোগ উত্থাপন এবং তা বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রচার করে মুসলমানদের মাঝে বিভ্রান্তি ছড়ানোকে দৈনন্দিন নেসাবী আমল বানিয়ে নিজেদের দ্বীন-ধর্ম তো বরবাদ করছেই, মুসলমানদের মাঝেও সঠিক দ্বীন সম্পর্কে সন্দেহের বীজ বপন করতে অপচেষ্টা চালাচ্ছে।

তবে একটি পর্যায়ে আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া সকলকেই করতে হয়, তাহলো, হাদীসে যেমন আছে 'আল্লাহ তা'আলা এই উম্মতকে গোমরাহীর ওপর ঐক্যবদ্ধ করেন না।' তেমনি এ কথাও বাস্তবতার আলোকে সত্য, হক্কানী জমাআতের মধ্যে ছদ্মবেশী মোনাফেকদেরকে আল্লাহ তা'আলা যেকোনো সময় জাহিরও করে দেন এবং মুসলমানদের মঝে তাদেরকে নিজেদের আচার-আচরণ, কথাবার্তা, লেখা-বক্তৃতা ইত্যাদির

মাধ্যমে চিহ্নিতও করে দেন। তাই তাদের কেউ নিজেরাই বলে দেন, আমি তাবলীগ জামাআতে অনেক দিন কাটিয়েছি। কিন্তু তাদের মধ্যে এই সেই... পেয়েছি। আমি দেওবন্দ মাদরাসাতেই পড়েছি। কিন্তু এখন তাওবা করেছি... ইত্যাদি। এসব হলো হক থেকে বাতিলকে পৃথক করা এবং মুসলমানদের মাঝে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার খোদায়ী পন্থা। সুতরাং মিডিয়াতে বসে বিভিন্নজনের উদ্ভট চেঁচামেচি, সামাজিক বিভিন্ন যোগাযোগ মাধ্যমে বাহারি অপপ্রচারে পরিতাপের কোনো কারণ নেই। বরং এর দ্বারা মোনাফেকরা নিজেদের কুৎসিত চেহরা নিজেরাই উন্মোচন করে হক্কানী জমাআত থেকে পৃথক হয়ে যায়।

একটি মূলনীতি

দ্বীন পালনের সহজার্থে একটি মূলনীতি সকল মুসলমানের মনে রাখা উচিত, তা হলো ইসলামের মূলধারা থেকে ছিটকে পড়া যাবে না। বরং তা হবে সম্পূর্ণরূপে গোমরাহী। দ্বীনের নামে রকমারি মোড়কে অনেক কিছু আসবে, অনেক জৌলুস-কৃত্রিম আড়ম্বরতা পরিদৃষ্ট হবে, কিন্তু সাহাবা, তাবেঈন, সলফে সালেহীনের পন্থাতে মূল ধারাবাহিকতায় অটল অবিচল থাকতে হবে। এর বাইরে যত কিছুই আমরা দেখব, মনে করতে হবে আরেকটি গোমরাহীর পদধ্বনি অথবা আল্লাহ তা'আলা বাতিলকে হক থেকে পৃথক করে মুসলমানদের মাঝে স্পষ্ট করে দিচ্ছেন।

একটি বিধর্মী নীলনকশা

সন্দেহপ্রবণতা একটি মহাফেতনা। আধুনিক প্রযুক্তির দ্রুত উন্নতির উপকার যদিও পুরো বিশ্ববাসী পেয়েছে;কিন্তু এর পরিকল্পিত বালা-মুসিবত সবই চাপানো হয়েছে মুসলমানদের ঘাড়ে। একেক সময় একেক কৃত্রিম সমস্যা সৃষ্টি করে মিডিয়ার মাধ্যমে মুসলমানদের বিপথগামী করার প্রচেষ্টাও বিরামহীনভাবে চলছে। এমন এমন ডাহা মিথ্যা অভিযোগও মুসলমানদের ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা চলছে, যাতে মুসলমানগণ পরস্পর সহাবস্থান থেকেও নিরাশ হয়ে পড়ে। তাই তো আজ সারা মুসলিম বিশ্বে কেউ হয়তো জঙ্গি, কেউ হয়তো দুর্নীতি পরায়ণ, কেউ ডিক্টেটর, কেউ মৌলবাদী, কেউ কেউ আতংকবাদী ইত্যাদি। এগুলো যে কারো নীলনকশারই বরকত এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। এ ক্ষেত্রে সব বিষয়ের একটি যোগসূত্র হলো সন্দেহ পরায়ণতা। এই নীলনকশা বাস্তবায়নে তাদের পুরোপুরি কামিয়াব বলা না গেলেও সফলতা অনেক।

সরাসরি ধর্মীয় আকীদা ও ইবাদাত বিষয়ে মুসলমানদের সন্দেহপ্রবণ করে তোলা, ধর্মীয় কর্ণধারদের–এমনকি পবিত্র কুরআন-হাদীসের ভক্তি-শ্রদ্ধা মুসলমানদের অন্তর থেকে নিশ্চিহ্ন করা এবং মুসলমানদের মাঝে বিভক্তির ওপর বিভক্তি ঘটিয়ে তাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও শক্তিকে ধ্বংস করা তাদেরই পরিকল্পিত অপপ্রয়াস। সঠিক জ্ঞান ও নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে পবিত্র কোরআন-হাদীস ও ইসলামের প্রারম্ভিক ইতিহাস পাঠে তা সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয়ে যায়।

এর ওপর ভর করে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন উলামায়ে কেরাম নবাগত বিভিন্ন ফেতনা সম্পর্কে মুসলমানদের সতর্ক করে থাকেন। যেহেতু মানুষের স্নায়ু বিকৃতির জন্য প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ওই মহল থেকে বেশির ভাগ মিডিয়াকেই ব্যবহার করা হয়। তাই উলামায়ে কেরাম বলে থাকেন মিডিয়াতে আসা ধর্মীয় কথাগুলো গ্রহণ করার ব্যাপারেও সতর্কতা আবশ্যক। অন্যান্য বিষয়ে তো আছেই।

অভিযোগের বন্যা

সম্প্রতি ইসলামের প্রতিটি বিষয়ে কিছু চিহ্নিত লোকের অভিযোগের শেষ নেই। মনে হবে সমাধান শুধুই শুধু তাদের মত ও পথ। বাকি সম্পূর্ণ ইসলাম অভিযুক্ত। তাদের এই অভিযোগের নিশান হয় সরাসরি খাইরুল কুরুনের (ইসলামের স্বর্ণালী অনুসরণীয় যুগ) মহাব্যক্তিগণ। সাহাবায়ে কেরামও তা থেকে বাদ নেই। (নাউজু বিল্লাহি মিন যালিক)। রাসূল (সা.)-এর ভাষ্য হলো, কিয়ামত পর্যন্ত আগত মুসলমানদের মডেল হলো খাইরুল কুরুন তথা ইসলামের অনুসরণীয় যুগ। এই চিহ্নিত মহলের ভাষ্য মতে ইসলামের মডেল হলো তারাই। অনেক ক্ষেত্রে খাইরুল কুরুনের মহাব্যক্তিবর্গ তো তাদের মাপকাঠিতে মুসলমান হিসেবে পরিগণিত কি না, তাতেও সন্দেহ সৃষ্টি হয়। (নাউজু বিল্লাহ)

শুধু এ বিষয়টি বিবেচনায় নিলেও নিঃসন্দেহে একজন মুসলমান বলতে পারবেন, এ ধরনের যাবতীয় আয়োজন বিধর্মীদের উল্লিখিত নীলনকশারই একমাত্র বাস্তবায়ন। বিষয়টিকে এতদভিন্ন মূল্যায়ন করার কোনো পন্থা এবং কোনো সুযোগ থাকে না।

ফাজায়েলে আমালের ব্যাপারে অভিযোগ

পবিত্র কুরআনের পর বর্তমানে সর্বাধিক পঠিত ও সর্বাধিক ভাষায় মুদ্রিত কিতাব 'ফাজায়েলে আমাল'-এর ব্যাপারে বিভিন্ন অভিযোগ, যা বিভিন্ন বই-পুস্তক, মিডিয়া ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আমরা পেয়ে থাকি তাও একই মহল থেকে একই পরিকল্পনার অধীনেই, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে যখন আমরা দেখব, অভিযোগগুলোর ধরণন কী? তাদের অভিযোগ কী এবং অভিযোগের বিপরীত তাদের হুকুম কী? অভিযোগের সাথে তাদের দাবি কী?

সর্বপ্রথম শিরকের অভিযোগ

ফাজায়েলে আমাল খুললেই দেখা যাবে হযরত যাকরিয়া (রহ.) লিখিত কিতাবের ভূমিকা। এই ভূমিকার একটি লাইন নিয়ে

ওই মহলের একটি অভিযোগের প্রতি লক্ষ করুন।

শিরোনাম দেওয়া হেয়েছে–'তাবলীগি নেসাবের ভূমিকাতেই শিরিক'। 'তাবলীগি নিসাবের লেখক শায়খুল হাদীস জাকারিয়া (রহ.) বলেন, "উলামায়ে কেরাম ও সূফীকুলের শিরোমণি, মোজাদ্দেদে দ্বীন, হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) আমাকে আদেশ করেন যে, তাবলীগে দ্বীনের প্রয়োজন অনুসারে কোরআন ও হাদীস অবলম্বনে যেন একটা সংক্ষিপ্ত বই লিখি। এত বড় বুযুর্গের সন্তুষ্টি বিধানে আমার পরকালে নাজাতের উসিলা হইবে মনে করিয়া আমি উক্ত কাজে সচেষ্ট হই।"

এখানে ওদের অভিযোগ হলো, আল্লাহর সন্তুষ্টি না চেয়ে মানুষের সন্তুষ্টির আশায় কিতাবটি তিনি লেখেছেন। সুতরাং তা শিরিক হয়েছে। শুধু এই দাবিটি করেই শিরক এবং কুফরের ওপর বিভিন্ন কোরআন-হাদীস এনে মুসলমানদের ধোঁকা দিতে চেষ্টা করা হয়ে থাকে। অথচ তারা খেয়াল করে না যে, তাদের দাবিটা কোথায় গিয়ে ঠেকে।

নিরসন : আল্লাহর সন্তুষ্টি আর মানুষের সন্তুষ্টি কি এক জিনিস?

হযরত যাকারিয়া (রহ.) প্রথমে হামদ সালাত পড়েন। তাতে আল্লাহর গুণগান ও রাসূল (সা.)-এর প্রতি দরুদ পাঠ করেন। অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়্যত এখান থেকেই আরম্ভ করেন। স্বয়ং ওসব মহলের মতে নিয়্যত মুখে বলা বিদআত! কিন্তু এ ক্ষেত্রে এসে তারা নিয়্যত মুখে না বলার কারণে মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করল!!

এরপর তিনি কিতাবটির প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ কিভাবে এবং কী কারণে কিতাবটি লেখার জন্য তিনি উদ্যোগী হলেন। এ ক্ষেত্রে বলেছেন, তাঁকে এই বিষয়ে কিতাব লেখার নির্দেশদাতা তাঁরই আপন চাচা হযরত ইলিয়াস (রহ.)-এর নির্দেশ পালনার্থে তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্য এই কিতাব লেখতে তিনি উদ্যোগী হলেন। তিনি সন্তুষ্ট হলে তাঁর জন্য দু'আ করবেন এবং তাঁর দু'আ হযরত শায়খুল হাদীস (রহ.)-এর নাযাত লাভের উসিলা হবে। এই হলো মূল ব্যাপার।

'মানুষকে সন্তুষ্ট করা শিরিক' কথাটি অযৌক্তিক। কারণ, পবিত্র কোরআন ও হাদীসে মাতা-পিতাকে খুশি ও সন্তুষ্ট করার নির্দেশ এসেছে। মুসলমানদের খুশি এবং সন্তুষ্ট রাখার কথা তো কোরআন-হাদীসে বিভিন্ন ভাবেই এসেছে। স্বয়ং রাসূল (সা.) বলেছেন যে,

وعنُ عبد اللّٰه بنِ عمرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنهُما، عن النبيِّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال) :(رِضَا اللّٰه فِي رِضَا الْوَالِدَيْنِ، وَسَخَطُ اللّٰه فِي سَخَطِ الْوَالِدَيْنِ .(أَخْرَجَهُ التِّرمذيُّ، وصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ والحاكِمُ.

অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টি পিতার সন্তুষ্টির মধ্যে আর আল্লাহর নারাযী পিতার নারাযীর মধ্যে। (তিরমিযী ২/১২ হা. ১৮৯৯)

এখন বিবেচনা করুন উক্ত অভিযোগকারী মিথ্যুক প্রতারকদের কথা 'মানুষকে সন্তুষ্ট করার জন্য কোনো কিছু করা শিরিক" এ অভিযোগ কোথায় গিয়ে ঠেকে? তাহলে কি তারা রাসূল (সা.) সম্পর্কেও এ অভিযোগ করল!!!

ফাজায়েলে আমালের বিন্যাস

ফাজায়েলে আমাল মূলত একটি কিতাব নয়। বরং বিভিন্ন সময় বিভিন্ন চাহিদার ভিত্তিতে লেখা কয়েকটি কিতাবের সংযুক্তরূপ। কিতাবগুলো হলো ১. হেকায়াতে সাহাবা। ২. ফাজায়েলে তাবলীগ। ৩. ফাজায়েলে কোরআন। ৪. ফাজায়েলে নামায। ৫. ফাজায়েলে রামাজান। ৬. ফাজায়েলে দরূদ। ৭. ফাজায়েলে যিকির। ৮. ফাজায়েলে হজ। ৯। ফাজায়েলে সাদাকাত।

যেহেতু তাবলীগ জামাআত কিতাবগুলোকে তাদের তালীমের নেসাবে অন্যতম হিসেবে গ্রহণ করেছে, তাই কিতাবগুলোকে বিভিন্ন প্রকাশক দাওয়াতের কাজে গমণকারীদের সহজার্থে একত্রিত ভলিয়ম আকারে বাইন্ডিং করেছেন। সে সময় এটির নাম হয়ে যায় তাবলীগি নেসাব। আরো বেশ কিছুদিন পর তাবলীগি মুরব্বিদের পরামর্শে এটিকে ফাজায়েলে আমাল নাম দিয়ে প্রকাশ করা হয়।

হযরত শায়খুল হাদীস (রহ.) ফাজায়েলে আমালের কিতাবগুলো কখন কেন এবং কিভাবে লেখেছেন, তারও বিস্তারিত আলোচনা বিভিন্ন কিতাবে উল্লেখ আছে। এই ছোট পরিসরে সেদিকে আমরা যাব না।

মূল আলোচনা বোঝার সহজার্থে কিতাবগুলোতে কোন নীতি অবলম্বন করা হয়েছে, তা জানার প্রয়োজন আছে। হযরত শায়খুল হাদীস (রহ.) কিতাবগুলোতে একটি নির্দিষ্ট নীতি অবলম্বন করেছেন। যে বিষয়ের কিতাব প্রথমে উক্ত বিষয়ে কোরআন মজীদের কিছু আয়াত উল্লেখ করে এর অর্থ এবং প্রয়োজনের ভিত্তিতে বড় বড় মোফাসসিরগণ থেকে নেওয়া তাফসীর উল্লেখ করেছেন। সংশ্লিষ্ট হাদীস থাকলে তাও উল্লেখ করেছেন। সাথে সাথে উক্ত আয়াতের নির্যাস এবং আবেদনকে বর্তমান প্রেক্ষাপটের সাথে মিলিয়ে কিছু জরুরি কথা বলেছেন। এতদসংক্রান্ত সলফে সালেহীনের কোনো ঘটনা থাকলে তাও উল্লেখ করেছেন।

এরপর উক্ত বিষয়ে কিছু হাদীস শরীফ উল্লেখ করেছেন। হাদীস শরীফের বেলায় তাঁর নীতি হলো প্রত্যেকটা হাদীস তিনি কোন কিতাব থেকে সংগ্রহ করেছেন, তা উল্লেখ করা। উক্ত হাদীসের ওপর মুহাদ্দিসগণের কোনো মন্তব্য থাকলে তাও সংক্ষিপ্ত আকারে উল্লেখ করেছেন। হাদীসের ওপর যে

আলোচনা তিনি উল্লেখ করেছেন তা শুধুমাত্র আলেম-উলামাদের জন্য বিধায় হাদীসের অনুবাদ করতে গিয়ে উক্ত আরবী আলোচনাগুলোর অনুবাদ করেননি। আবার হাদীসের আলোচনায় যেদিক থেকে হাদীসটি তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়েছে, উক্ত দিকগুলোই বেশির ভাগ আলোচনা করেছেন।

এর কারণ হলো, হাদীসের ওপর কালাম শুধুমাত্রই মুহাদ্দিসগণের মতামত। এসব কোনো কোরআন-হাদীসের ফায়সালা নয়। সুতরাং যে মত তিনি পছন্দ করেছেন, সে মতকেই প্রাধান্য দিয়ে তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি একজন বিখ্যাত হাদীস বিশারদ হিসেবে আমানতদারীর সাথে এই কাজ করা তাঁর দায়িত্বও বটে।

এরপর তিনি উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বড় বড় মুহাদ্দিসগণের মতামত, আরো কিছু আনুষঙ্গিক আয়াত ও হাদীস, মুসলমানদের কাছে উক্ত হাদীসের আবেদন, হাদীসের আবেদনের ভিত্তিতে বর্তমান প্রেক্ষাপটে মুসলমানদের করণীয়, এতদসংশ্লিষ্ট উৎসাহ প্রদানকারী সলফে সালেহীনদের কিছু ঘটনা ইত্যাদি বর্ণনা করেছেন। যাতে সব মিলিয়ে উক্ত আয়াত ও হাদীসের ওপর আমল করার জন্য মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক স্পৃহা সৃষ্টি হয়।

ফাজায়েলে আমালের ওপর আরোপিত অপবাদগুলোর সামগ্রিক বিশ্লেষণ

ফাজায়েলে আমালের ওপর আরোপিত অপবাদের মৌলিক ধরন তিনটি।

১. ফাজায়েলে আমালে জয়ীফ ও মওজু হাদীস রয়েছে।

২. ফাজায়েলে আমালে মিথ্যা ও শিরকী কাহিনীর ছড়াছড়ি।

৩। কোরআন-হাদীসের অপব্যাখ্যা এবং ভ্রান্ত তর্জমা।

এসব অপবাদ দিয়ে ফাজায়েলে আমালের ওপর হুকুম আরোপ করা হয় কিতাবটি বিদআতী এবং শিরকী কিতাব।

এই হুকুমের ওপর ভিত্তি করে দাবি জানানো হয় কিতাবটি বর্জনীয়। অর্থাৎ কিতাবটি পড়া যাবে না।

এই দাবি পালনে উৎসাহিত হওয়ার জন্য এর সাথে এ কথাও জুড়ে দেওয়া হয়, মুসলমানদের কাজ হলো শুধু কোরআন ও হাদীস পড়া। সেখানে ফাজায়েলে আমাল কেন পড়া হবে?

এই হলো ফাজায়েলে আমাল নিয়ে মিডিয়া জগতে একটি মহল থেকে একতরফা তোলপাড়ের মূল পরিধি।

নাস্তিকদের একটি নীতি আছে তা হলো, "মিথ্যা কথা বার বার বলো। একসময় তা সত্যের মতই বিবেচিত হবে।"

তোলপাড়ের ধরন দেখে মনে হবে উক্ত মহল এই নীতিমালাটিই সব ক্ষেত্রে গ্রহণ করে থাকে। কারো কথা শোনার দরকার নেই, শুধু মিথ্যা বলতেই থাকো।

প্রতারণার প্রতি সামান্য ইঙ্গিত

ফাজায়েলে আমালের বেলায় তারা বলে থাকে, ইসলামের হুকুম হলো কোরআন-হাদীস পড়া। মুসলমানগণ ফাজায়েলে আমাল কেন পড়ে?

প্রিয় পাঠক, একটু চিন্তা করুন। তাদের কথাটা কত সুন্দর, কত চিত্তাকর্ষক। মুসলমান মাত্রই এই কথা গ্রহণ করতে দেরি হবে না। কিন্তু আপনি তাদের কাছে এই প্রশ্নটা করেছেন? আচ্ছা হুজুর! আপনি যে ফাজায়েলে আমালের ব্যাপারে বই লিখলেন, বা মিডিয়ায় কমেন্ট করলেন তা কি পড়ার জন্য লেখেছেন, নাকি এমনিতেই? যদি আপনি বইটি পড়ার জন্যই লেখে থাকেন, তাহলে কেউ না কেউ এ কিতাব বা কমেন্ট পড়বে। আপনার দাবি মতে যাদের শুধু কোরআন-হাদীস পড়াই আবশ্যক, অন্য কিছু পড়া হারাম তাদেরকে আপনি হারামে লিপ্ত করার জন্যই কি এই কিতাব লিখলেন। আপনাদের যারা বিভিন্ন কিতাবাদী লেখেন তারাও কি মুসলমানদের হারাম কাজে লিপ্ত করার জন্য লেখছেন?... নাকি আপনি মুজাস্সাম কোরআন-হাদীস?!! (নাউজু বিল্লাহ)

তাহলে দোষ কি শুধু ফাজায়েলে আমালের?

তখন আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন তাদের প্রতারণামূলক কথার হাকীকত কী?

আমাদের এই আয়োজনে যা থাকছে

উল্লিখিত তিন ধরনের অপবাদের মধ্যে আমাদের এই আয়োজনের উদ্দেশ্য হলো, হাদীসবিষয়ক আলোচনা। আমরা দেখব ফাজায়েলে আমালে কি সবই জয়ীফ হাদীস, না অন্যান্য হাদীসের কিতাবের মতো কিছু কিছু তাতেও জয়ীফ হাদীস রয়েছে? যদি অন্যান্য হাদীসের কিতাবের মতো এতে সহীহ হাদীসের পাশাপাশি কিছু জয়ীফ হাদীসেরও উপস্থিতি থাকে, তাহলে শুধু ফাজায়েলে আমাল বর্জনীয় কেন? জয়ীফ হাদীস যদি সত্যিকার অর্থেই বর্জনীয় হয় এবং জয়ীফ হাদীসের কারণে যদি কিতাবই পড়া বাদ দিতে হয় তবে তো দুনিয়ায় একটি কিতাবও এমন পাওয়া যাবে না, যাতে কারো না কারো মতের ভিত্তিতে কোনো জয়ীফ হাদীস নেই।

এখানে দুটি কথা, যারা জয়ীফ এবং মওজু হাদীস বলে ফাজায়েলে আমালের ওপর অপবাদ দিয়ে তা বর্জন করার জন্য দাবি জানাচ্ছেন তারা কি মুসলমানদেরকে এই উসূলের ভিত্তিতে সকল হাদীসের কিতাবই বাদ করে দেওয়ার আগাম মেসেজ দিচ্ছেন, নাকি ফাজায়েলে আমালের কারণে মানুষ হেদায়াতপ্রাপ্ত হচ্ছেন বিধায় নিজেদের আক্রোশ এবং জিঘাংসাকে মানুষের সামনে অন্য ভাষায় প্রকাশ করছেন?

এ বিষয়টি বোঝার জন্য প্রয়োজন হাদীসের নীতিমালা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এবং ফাজায়েলে আমালের হাদীসগুলোর

রেফারেন্স ও তাহকীক।

হাদীসের উসূল সম্পর্কে আলোচনা অনেক দীর্ঘ। উলামায়ে কেরাম এ সম্পর্কে বড়-ছোট অনেক কিতাব রচনা করেছেন। তাই হাদীসের নীতিমালা সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা এখানে করা হবে না। পাঠকগণ প্রয়োজনে কিতাবাদী পাঠ করে তা জেনে নিতে পারবেন।

ইনশাআল্লাহ ছুম্মা ইনশাআল্লাহ এই আয়োজনে ধারাবাহিকভাবে ফাজায়েলে আমালের আরবীতে লেখা মূল হাদীসগুলো এবং আনুষঙ্গিকভাবে উর্দুতে ছোট ছোট যেসব হাদীসের অনুবাদ আনা হয়েছে, সেগুলোর তাখরীজ এবং তাহকীক প্রকাশ করা হবে।

এর পূর্বে যে বিষয়গুলো আমাদের জানা থাকা প্রয়োজন, তা হলো জয়ীফ হাদীস গ্রহণযোগ্য কি না এবং মুহাদ্দিসগণ তাদের কিতাবে জয়ীফ হাদীস এনেছেন কি না?

জয়ীফ হাদীস সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা

একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য : হাদীস সহীহ, জয়ীফ ও মওজু হওয়ার বিষয়টি সম্পূর্ণই মুহাদ্দিস ও ফকীহগণের মতামত। তাও এটি আবার দুই প্রকার। হাদীসের বর্ণনাকারীর নির্ভরযোগ্যতা-অনির্ভরযোগ্যতা তথা সনদের ওপর যে আলোচনা তা বর্ণনাকারী তথা রাবীদের সাথে সংশ্লিষ্ট। তা পুরোপুরি মুহাদ্দিস ও ফকীহগণের মতামত। হাদীসের মতন নির্ভরযোগ্য কি অনির্ভরযোগ্য তার ভিত্তিও ফকীহ ও মুহাদ্দিসদের মতামত। এক্ষেত্রে ইমাম, মুহাদ্দিস ও ফকীহগণের মূলনীতিও একেক রকম। সহীহ ও জয়ীফ হাদীসের ওপর আমল করা জায়েয-নাজায়েযের হুকুমও উলামায়ে কেরামের ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত। সুতরাং কেউ যদি মনে করে হাদীস সহীহ জয়ীফ হওয়ার বিষয়টিও কোরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, তা হবে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা ও মনগড়া ব্যাখ্যা। সুতরাং যারা বলবে ইসলামে ইজমা, কিয়াস (অনুমান) এবং উলামায়ে কেরামের মতামতের কোনো ভিত্তি নেই, তাদের জন্য হাদীসের সহীহ জয়ীফ হওয়ার বিষয়টি গ্রহণ এবং তার ওপর আলোচনা করার কোনোই যৌক্তিকতা নেই, যৌক্তিক অধিকারও নেই। কেউ যদি সে রকম করে, তা হবে স্পষ্ট নির্লজ্জতা এবং প্রতারণার শামিল।

হাদীস অস্বীকারের ভয়ঙ্কর প্রচারণা

সম্প্রতি হাদীস সম্পর্কে একটি মহল মুসলমানদের মাঝে জয়ীফ জয়ীফ বলে হাদীসের প্রতি যেভাবে ঘৃণা সঞ্চারের চেষ্টা করছে, তা সত্যিই উদ্বেগজনক। মূলত জয়ীফ আখ্যায়িত করে হাদীসকে ঘৃণা করা মানে হাদীস অস্বীকার করা। জয়ীফ হাদীস আর মওজু হাদীসের একই হুকুম যারা বর্ণনা করে তারা মুনকিরীনে হাদীসেরই একটি দল। কারণ সহীহ জয়ীফ সনদ হিসেবে হাদীসের প্রকার। সনদের ক্ষেত্রে জয়ীফ হলেও তা হাদীসেরই অন্তর্ভুক্ত। সে কারণে দুনিয়ার সকল মুহাদ্দিস যেকোনো ভাবে হলেও জয়ীফ হাদীস গ্রহণ করেছেন। সুতরাং জয়ীফ হাদীস অস্বীকারকারীও মুনকিরে হাদীস তথা হাদীস অস্বীকারকারী। তবে মওজু বা বানানো হাদীস পরিত্যাজ্য। জয়ীফ হাদীস পরিত্যাজ্য নয়। সামনের আলোচনায় তা ইনশাআল্লাহ স্পষ্ট হবে।

জয়ীফ হাদীসের বিধান

সকল উলামায়ে কেরামের ঐক্যবদ্ধ মতামত হলো, হাদীসের সনদ যদি অত্যন্ত জয়ীফ হয় তার ওপর আমল করা জায়েয নেই। এই ইজমা আল্লামা সুয়ূতী ও হাফেজ সালাহুদ্দীন (রহ.) উল্লেখ করেছেন। (তাদরীবুর রাবী ১/২৯৮) (বাস্তবতার আলোকে দেখা যায় এ ক্ষেত্রে অত্যন্ত জয়ীফ বলতে মূলত মওজু হাদীসকেই বোঝানো হয়েছে)

যদি হাদীসের সনদ অত্যন্ত জয়ীফ না হয় তবে মুহাদ্দিসগণের ইজমা হলো এরূপ হাদীস ফাজায়েলে আমাল, আখলাক, কাহিনী এবং তারগীব তারহীবের বেলায় গ্রহণযোগ্য। এই ইজমার কথা উল্লেখ করেছেন, আল্লামা নববী (রহ.) ও মোল্লা আলী কারী (রহ.)। (তাঁদের বর্ণিত এই ইজমাসহ জয়ীফ হাদীস আমলযোগ্য এ সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণের মতামত জানার জন্য দেখুন আলফাতহুল মুবীন লিল হায়সামী পৃ ৩২, ফতহু বাবুল ইনায়া ১/৪৯, আল হাজ্জুল আওফার ফীল হজ্জিল আকবর বা/১৪৯, মিরকাত ২/৩৮১, আল আসরারুল মরফূআ ৩১৫, মুকাদ্দামুত তারীফ ১/৯৮, আল কিফায়া ১৩৩, আলমাদখাল ইলা কিতাবিল ইকলীল ২৯, মুকাদ্দামুল জারহে ওয়াত্তাদীল ২/৩০, শরহুল আলফিয়া ২/২৯১, শরহে ইললিত তিরমিযী ১/৭২-৭৪, মজমুউল ফতাওয়া ১৮/৬৫,৬৭, ফতহুল আলাম ৩৮২, আলমজমু লিননববী ৩/৩৪৮, আত্তাক্বরীব বিশরহিততাদরীব ১৯৬, আল আযকার ৭,৮, ইনসানুল উয়ূন ফীসীরাতিল আমীন মামুন ১/২, উয়ূনুল আসর ১/১৫, আলমাদখালুস সগীর ৩৭, জামেউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাজলিহী ১/২২, ফতহুল মুগীছ ১২০, উলূমুল হাদীস ৯৩, আল ফাতহুল মুবীন ৩৩, তানকীহুল আনযার ২/১০৯-১১১, আলমাকামাতুস সুনদিসিয়্যা পৃ. ৫, আল মুগনী ১/১০৪৪, আল ইখতিয়ারাতুল ইলমিয়্যা লিইবনি তাইমিয়া ১১০০, আত্তারজীহ লি আহাদীসি সালাতিত তাসবীহ পৃ৩৬, শরহু কাওকাবুল মুনীর ২/৫৬৯, নাইলুল আওতার ৩/৬৮)

'ফাজায়েলের ক্ষেত্রেও জয়ীফ হাদীস আমলযোগ্য নয়'– কথাটি ঠিক নয়?

শায়খ জামালুদ্দীন কাসেমী (রহ.) তাঁর কাওয়ায়েদুত তাহদীস কিতাবে (পৃ. ১১৩ তে) লেখেন, কেউ কেউ বলেছেন ইমাম

বোখারী (রহ.), ইমাম মুসলিম (রহ.), ইয়াহয়া ইবনে মুঈন (রহ.) এবং আবু বকর ইবনুল আরবী (রহ.)-এর মতে ফাজায়েলের ক্ষেত্রে জয়ীফ হাদীসের ওপর আমল করা যাবে না। সেরূপ আল্লামা ইবনে সায়্যিদিন নাস ইয়াহয়া ইবনে মুঈন সম্পর্কে, আল্লামা সাখাবী (রহ.) ইবনুল আরবী মালেকী (রহ.) সম্পর্কে, ইবনে রজব হাম্বলী (রহ.) ইমাম মুসলিম (রহ.) সম্পর্কে এবং আল্লামা শাহরাস্তানী আল্লামা ইবনে হাযম (রহ.) সম্পর্কে এরূপ বলেছেন। (উয়ূনুল আসর ১/২৪, ফতহুল মুগীস ১/২৬৮, শরহু ইলালিত তিরমিযী ১/৭৪)

অথচ এ সকল মুহাদ্দিস ইমামগণ থেকে সরাসরি এমন কোনো কথা পাওয়া যায় না যে, ফাজায়েলে আমালের ক্ষেত্রে জয়ীফ হাদীসের ওপর মোটেও আমল করা যাবে না। বরং স্বয়ং ইমাম বোখারী (রহ.)-এর কর্মপদ্ধতি থেকে বোঝা যায় ফাজায়েলের ক্ষেত্রে জয়ীফ হাদীসের ওপর আমল তাঁর মতেও জায়েয। যেমন হাফেজ ইবনে হাজর আসকলানী (রহ.) ফতহুল বারীর মুকাদ্দামায় মুহাম্মদ ইবনে আব্দু রহমান তাফাবীর ব্যাপারে كن فى الدنيا كانك غريب এর অধীনে লেখেন, "এই হাদীস তো তাফাবী একাই বর্ণনা করেন। এটি 'সহীহুন গরীবুন'-এর আওতায় পড়ে। মনে হয়, ইমাম বোখারী (রহ.) তারগীব ও তারহীবের ক্ষেত্রে নিজের শর্তসমূহ পুরোপুরি আমলে নেন না। (হাদয়ুসসারী, পৃ. ৪৬৩)

মোট কথা হলো, সহীহে বোখারীর বিভিন্ন বর্ণনাকারীর ওপর বিভিন্নজনের প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্য আল্লামা ইবনে হাজর (রহ.) তাঁর কিতাব 'হাদয়ুসসারী মুকাদ্দামাতি ফতহিল বারী' তে একটি 'বাব' কায়েম করেন। তাতে বোখারী শরীফের বিভিন্ন রাবীর ব্যাপারে বিভিন্ন জবাব দিতে গিয়ে বলেছেন, এই হাদীসটি তারগীব তারহীব ও রেকাকের বিষয়। আল্লামা জফর আহমদ উসমানী তাঁর কিতাব 'কাওয়ায়েদুল হাদীসে تساهل البخارى فى احاديث الترغيب والترهيب শিরোনামের অধীনে হাফেজ ইবনে হাজর আসকলানী (রহ.)-এর জবাবের পর্যালোচনা করতে গিয়ে লেখেন, এতে এ কথার সমর্থন পাওয়া যায় মুহাদ্দিসীনগণ ফাজায়েলের হাদীসের ক্ষেত্রে নম্রতা পোষণ করে থাকেন, যদিও কিছু লোক এসব বিষয়ে খামোখা জড়িত হন এবং কঠিন শর্ত আরোপ করে থাকেন।

বোখারী শরীফ ব্যতীত ইমাম বোখারী (রহ.)-এর অন্যান্য কিতাবে তিনি জয়ীফ হাদীস বর্ণনা করেছেন। যেমন ইমাম বোখারী (রহ.)-এর কিতাব, 'খলকু আফআলিল ইবাদ', 'জুযউ রফইল ইয়াদাইন', 'জুযউল কিরাআতি', 'আল আদবুল মুফরাদ' ইত্যাদির বিভিন্ন নুসখায় বহু জয়ীফ হাদীস রয়েছে বলে মুহাদ্দিসগণ মত পোষণ করেছেন।

তারীখে কবীরে রাবীদের উল্লেখ হিসেব ড. মুহাম্মদ আব্দুল করীম বলেন, মরফূ হাদীসের সংখ্যা মোট ১১২৭। তাতে ২১০টি সহীহ, ৩৭০ হাসান, জয়ীফ হাদীস ৩৯৯ এবং মওজু হাদীস একটি।

ইমাম মুসলিম (রহ.) সহীহে মুসলিম ব্যতীত অন্যান্য কিতাবেও জয়ীফ রাবীর হাদীস বর্ণনা করেছেন এমন প্রমাণ মুহাদ্দিসগণের লেখাতে পাওয়া যায়। (দেখুন ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর কিতাব 'আততামীয' তাহকীক ড. মুস্তফা আজমী)

এ ছাড়া মুহাদ্দিসীনদের আরো বিভিন্ন দীর্ঘ আলোচনা থেকে বোঝা যায়, ইমাম বোখারী (রহ.) ও ইমাম মুসলিম (রহ.) বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফের বেলায় হাদীসের সিহহাতের ওপর যে কঠোরতা অবলম্বন করেছেন, তা তাদের অন্যান্য কিতাবে পুরোপুরি অবলম্বন করেননি। এই বাস্তবতা প্রমাণ বহন করে ইমাম বোখারী (রহ.) ও মুসলিম (রহ.)-এর মতেও জয়ীফ হাদীস আমলযোগ্য।

জয়ীফ হাদীস আমলযোগ্য হওয়া না হাওয়ার ব্যাপারে মুহাদ্দিসে কবীর ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন (রহ.)-এর দুটি মত পাওয়া যায়। আল্লামা ইবনে সায়্যিদিননাস বর্ণনা করেন, নাজায়েয। (উয়নুল আছর ১/৬৫) খতীবে বাগদাদী ও আল্লামা সাখাবী (রহ.) বর্ণনা করেন, জায়েয। (কেফায়া ২১৩, ফতহুল মুগীছ ১/৩২২) হযরত ইবনে আদী ইবনে মরয়াম থেকে বর্ণনা করেণ যে, তিনি বলেন, আমি ইবনে মুঈনকে বলতে শুনেছি যে, রেকাক বিষয়ে ইদ্রিস ইবনে সেনান থেকে হাদীস নেওয়া যাবে। (আল কামেল ১/৩৬৬) এই কথা থেকে জয়ীফ হাদীস ফাজায়েল ইত্যাদির ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হওয়াই হযরত ইবনে মুঈনের শক্তিশালী মত বলে প্রমাণিত হয়।

ইমাম আবু হানীফা (রহ.) ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর মত হলো, কোনো বিষয়ে রাসূল (সা.)-এর কোনো সহীহ হাদীস পাওয়া না গেলে যদি উক্ত বিষয়ে জয়ীফ হাদীস থাকে তবে কিয়াস করার চেয়ে জয়ীফ হাদীস উত্তম। ইমাম ইবনে হাজমও এর ওপর একমত পোষণ করেছেন। (দেখুন আল আহকাম ফী উসূলিল আহকাম ৭/৫৪, আল মহল্লী ৪/১৪৮)

কাজী শাওকানী (রহ.)-এর কিতাবাদী যেমন নাইলূল আওতার, তুহফাতুয যিকির এবং ফতহুল কদীর ইত্যাদি কিতাবাদীতে, যেখানে তিনি সিহহাতের শর্ত লাগিয়েছেন তাতেও মুহাদ্দিসগণের মতে জয়ীফ হাদীসের অভাব নেই। (আল ফাওয়ায়েদুল মজমুআ, পৃ. ২৮৩)

মুহাদ্দিস মাহমূদ সঈদ 'আততারীফ' গ্রন্থে উল্লেখ করেন, ফাজায়েলের ব্যাপারে জয়ীফ হাদীস অগ্রহণযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে আল্লামা ইবনুল আরবীর কোনো স্পষ্ট কথা উল্লেখ নেই। (আততারীফ, পৃ. ১০১)

বিশেষ সম্প্রদায়ের ইমাম নবাব সিদ্দীক হাসান খান কনুজী নিজ কিতাব 'নযলুল আবরার'-এর শুরুতে দাবি করেছেন যে, তিনি জয়ীফ হাদীস বর্ণনা করবেন না। এমনকি বিভিন্ন স্থানে তিনি আল্লামা নববী (রহ.)-এর বিরোধিতা করেছেন, কিন্তু তিনি তার কিতাব জয়ীফ হাদীস দ্বারা ভরে দিয়েছেন।

এমনিভাবে দীর্ঘ মোতালাআর পর এ কথা নিশ্চয়ই প্রমাণিত হয় যে, জয়ীফ হাদীস ঢালাওভাবে সম্পূর্ণরূপে অগ্রহণযোগ্য বলাটা পুরোপুরি ভুল ও ভ্রান্ত। বরং সবার কাছে কিছু না কিছু পর্যায়ে জয়ীফ হাদীসের ওপর আমলের গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে।

হাদীস বর্ণনা করার সময় সহিহ ও জয়ীফ উল্লেখ করা জরুরী বিষয় নয়

মুহাদ্দিসগণের নিকট জয়ীফ হাদীসের ওপর এর জূউফ উল্লেখ করা শর্ত নয়। আল্লামা ইবনুস সালাহ তাঁর 'মুকাদ্দামা'তে লেখেন, জয়ীফ হওয়ার হুকুম উল্লেখ করা ছাড়াই এধরনের হাদীস বর্ণনা করা যায়। তবে আল্লামা ইবনুসসালাহ জয়ীফ হাদীস বর্ণনা করার কিছু পদ্ধতি বাতলিয়ে দিয়েছেন। (মুকাদ্দামায়ে উবনুসসলাহ ১১২)

আল্লামা ইরাকী (রহ.) বলেন, জয়ীফের হুকুম উল্লেখ করা ছাড়াই বর্ণনা করা জায়েয। (আলফিয়্যাতুল হাদীস ১/৩৩০)

বিভিন্ন কিতাবে জয়ীফ হাদীস

আকায়েদের কিতাব :

উপরের আলোচনায় বোঝা গেল মুহাদ্দিসীনের কাছে ফাজায়েলের ক্ষেত্রে জয়ীফ হাদীস গ্রহণীয়। কিন্তু আকায়েদের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম। আকায়েদ সাব্যস্ত হতে হয় কতয়ী দলিল দ্বারা। সে কারণে আকায়েদের কিতাবাদীতে জয়ীফ হাদীস না থাকা বাঞ্ছনীয়। তার পরও এখানে কয়েকটি কিতাবের কথা উল্লেখ করা হচ্ছে, যেগুলো আকায়েদের গুরুত্বপূর্ণ কিতাব হওয়া সত্ত্বেও জয়ীফ হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে।

১. হাফেজ আবু বকর উমর ইবনে আবু আসেম জহহাক ইবনে মুখাল্লাদ আশশায়বানী (রহ.)-এর 'কিতাবুস সুন্নাহ' কিতাবে মুহাদ্দিসগণের মতে ২৯৮টি জয়ীফ হাদীস রয়েছে।

২. ইমাম আবু আব্দুর রহমান ইবনে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল আশশায়বানী (২৯০ হি.)-এর কিতাব 'কিতাবুস সুন্নাহ'-এ জয়ীফ হাদীসের সংখ্যা ৩০৩ বলে মুহাদ্দিসীনগণের মতামত রয়েছে।

৩. আবু বকর আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হারুন খাল্লাল (৩১১ হি.)-এর 'কিতাবুস সুন্নাহ' গ্রন্থে ৩৮৯টি জয়ীফ হাদীস আছে বলে মুহাদ্দিসগণের মত।

৪. আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে হুসাইন আজরী বাগদাদীর 'কিতাবুশ শরীআ'তে মুহাদ্দিসীনের মতে ৬৫৭টি জয়ীফ ও কিছু মওজু হাদীস রয়েছে।

৫. ইমাম বায়হাকী (রহ.)-এর 'কিতাবুল আসমা ও ওয়াসসিফাত' গ্রন্থে মুহাদ্দিসগণের মতে ৩২৯টি জয়ীফ হাদীস রয়েছে। (দেখুন তাহকীকুল মাকাল)

আহকামের কিতাবে জয়ীফ হাদীস

আকায়েদের ক্ষেত্রে জয়ীফ হাদীসের ব্যাপারে যে কঠোরতা, সে তুলনায় আহকামের ব্যাপারে কিছুটা গৌণ। তাতেও দীর্ঘ মোতালাআর পর দেখা যায় বিভিন্ন ইমাম নিজ নিজ শর্ত ও নীতিমালা সাপেক্ষে জয়ীফ হাদীস গ্রহণীয় বলে মত দিয়েছেন। বাস্তব ক্ষেত্রে তা পালনও করা হয়েছে।

আল্লামা সুয়ূতী (রহ.) বলেন, আহকাম ও মাসায়েলের ক্ষেত্রে জয়ীফ হাদীসের ওপর আমল করা যাবে, যদি অতিরিক্ত সাবধানতা ও সতর্কতা তাতেই নিহিত থাকে। (আততাদরীব ১/২৯৯)

আল্লামা যারকাশী (রহ.) লেখেন, (আল্লামা ইবনে সালাহ) আহকামের ক্ষেত্রে জয়ীফ হাদীস গ্রহণ করা যাবে না বলে যে মত প্রকাশ করেছেন, তাতে কিছু সূরত উক্ত মতের বহির্ভূত রাখা সমীচীন। প্রথম বিষয় হলো, যদি উক্ত হাদীস ছাড়া উক্ত বিষয়ে আর কোনো হাদীস না থাকে। আল্লামা মাওয়ারদী বলেন, ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর কাছে কোনো বিষয়ে যদি মুরসাল হাদীস ছাড়া অন্য হাদীস না থাকত তখন তিনি উক্ত মুরসাল হাদীসকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করতেন। আল্লামা মাওয়ারদীর রায় হলো অন্যান্য জয়ীফ হাদীসেও একই হুকুম। ইমাম আহমদ (রহ.)-এর আমলও এরূপ, যদি জয়ীফ হাদীসের বিপক্ষে কোনো সহীহ হাদীস না পেতেন তবে উক্ত জয়ীফ হাদীস দলিল হিসেবে গ্রহণ করতেন। (আন নিকাত আলা ইবনিস সালাহ ২২/৩১৩) ইমাম আবু হানীফা (রহ.) কোনো বিষয়ে কোনো জয়ীফ হাদীস থাকলে তখন কিয়াসের ওপর উক্ত হাদীসকেই প্রাধান্য দিতেন। (আল আহকাম ফী উসূলিল আহকাম ৭/৫৪)

ইমাম শওকানীর উস্তাদ শায়খ আব্দুল কাদের ইবনে আহমদ আর কুকাবানী লেখেন, যখন মুতাআখখেরীন মুহাদ্দিসগণ (পরের যুগের মুহাদ্দিসগণ) বলেন, এটি গাইরে সহীহ বা সহীহ নয় তখন এর উদ্দেশ্য এমন নয় যে, উক্ত হাদীস অগ্রহণযোগ্য, বা আমলযোগ্য নয়। এর উদ্দেশ্য এও নয় যে, এর ওপর আমল জারি নেই। আমরা এরূপ অর্থবোধক একটি শব্দও তাদের কাছে পাই না। সুতরাং পরের যুগের কোনো মুহাদ্দিস যদি বলেন যে, এটি গাইরে সহীহ বা সহীহ নয়। তখন তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে এবং এটির তাহকীক করা হবে। যদি উক্ত হাদীস হাসন বা জয়ীফ এবং তার ওপর আমল থাকে তবে এর ওপর আমল করা যাবে। অন্যথায় ত্যাগ করা হবে।

(আত্তুহফাতুল মরজিয়্যা ফী হল্লি বা বাজিল মাশকিলাতিল হাদীসিয়্যাহ, পৃ. ১৮৬)

এ বিষয়টিও অতিদীর্ঘ। সব কিছুর মুতালাআর পর এ কথাই সিদ্ধান্ত হবে যে, কখনও কখনও আহকামের ক্ষেত্রেও জয়ীফ হাদীস গ্রহণযোগ্য।

ফিকহী কিতাবসমূহে জয়ীফ হাদীস

আল মুন্তাকা। এটি হলো শায়খে হাম্বলী, আবুল বারাকাত ইমাম হাফেজ মজদুদ্দীন আব্দুস সালাম ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আবীল কাসেম ইবনে মুহাম্মদ ইবনিল খাজর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আবদিল্লাহ আল হাররানী আল মারূফ বি ইবনি তাইমিয়ার কিতাব।

কিতাবের প্রারম্ভে লেখেন, এটি রাসূল (সা.)-এর হাদীসের একটি মজমুআ। যার ওপর উসূলে ফিকহের ভিত্তি। উলামায়ে ইসলাম এই কিতাবের ওপর আস্থাশীল। আমি সহীহ বোখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, নাসায়ী, আবু দাউদ এবং ইবনে মাজা থেকে হাদীসগুলো চয়ন করেছি।

এই কিতাব সম্পর্কে আল্লামা শওকানী লেখেন, হাদীস শাস্ত্রের একটি অভিজ্ঞ দল বলেছেন, যদি 'মুনতাকা'র মধ্যে হাদীসের হুকুম লাগিয়ে দিতেন তবে এটি হাদীস শাস্ত্রের বড় উন্নত কিতাব হতো...।

অথচ এই কিতাবে মুহাদ্দিসগণের তাহকীক অনুযায়ী ২৬২টি জয়ীফ হাদীস রয়েছে।

হাফেজ ইবনে হাজর (রহ.)-এর কিতাব বুলুগুল মরাম ফী আদিল্লাতিল আহকাম। মুহাদ্দিসীনদের হিসাব মতে, এই কিতাবে ১১৭টি জয়ীফ হাদীস রয়েছে।

ইমাম নববী (রহ.)-এর কিতাব খুলাসাতুল আহকাম মিন মুহিম্মাতিস সুনান ওয়া কাওয়ায়িদিল ইসলাম। ইমাম নববী (রহ.) আহকামের হাদীস জমা করে তা থেকে বেছে বেছে শুধু সহীহ ও হাসান হাদীস একত্রিত করে সংকলন করেছেন খুলাসাতুল আহকাম। মুহাদ্দিসীনের গণনায় এই কিতাবে জয়ীফ হাদীসের সংখ্যা ৬৫৪।

ইবনুল মুলাক্কিন শাফেয়ীর কিতাব তুহফাতুল মুহতাজ। এই কিতাব সম্পর্কে লেখক নিজেই লেখেন, এই কিতাবে উল্লিখিত সকল মাসায়েল সম্পর্কে সহীহ ও হাসান হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। কথা হলো, জয়ীফ হাদীসের এবং আসারের। তা যথাসম্ভব কম পেশ করেছি। তবে এই কিতাবের আমারই লিখিত শরাহ উমদাতুল মুহতাজ ইলা কুতুবিল মিনহাজে আমি জয়ীফ হাদীস দ্বারা বিভিন্ন স্থানে দলীল গ্রহণ করেছি। (মুকাদ্দামায়ে তুহফাতুল মুহতাজ ১/১২৯,১৩০)

এখানে কয়েকটি কিতাবের কথা উল্লেখ করা হলো। যেগুলোতে আহকামের ক্ষেত্রেও জয়ীফ হাদীস দ্বারা দলিল গ্রহণ করা হয়েছে। তাতে বোঝা যায়, মুহাদ্দিসীনের কাছে জয়ীফ হাদীস আহকামের ক্ষেত্রেও গ্রহণীয় এবং প্রায় আহকামের কিতাবে জয়ীফ হাদীস রয়েছে।

আলবানী সাহেবের কীর্তি

শায়খ আলবানী সাহেব তো গোটা হাদীসের জগতকে দুই ভাগে ভাগ করে ফেলেছেন। এক ভাগের নাম তাঁর ভাষায় সহীহ, অপর ভাগের নাম জয়ীফ। এবার বলুন কোনো কিতাবে যঈফ হাদীস থাকলেই যদি তা বর্জনীয়, ছুড়ে ফেলার উপযুক্ত, পাঠের অযোগ্য দলিল হিসেবে অগ্রহণযোগ্য হয়ে যায় তাহলে তো ওই চিহ্নিত মহলটির কাছে গ্রহণযোগ্য কোনো হাদীসের কিতাবেরই অস্তিত্ব থাকে না। তবে তারা বোখারী-বোখারী, মুসলিম-মুসলিম বলে যিকির করলে কি লাভ হবে?

অত্যন্ত সংক্ষিপ্তাকারে কিছু আলোচনা করা হলো। এসব আলোচনা অত্যন্ত দীর্ঘ। ফন্নী বা শাস্ত্রিকভাবে আলোচনা করতে গেলে কয়েক শ পৃষ্ঠাতেও আলোচনা শেষ হবে না। কিন্তু নবাবিষ্কৃত কিছু লোকের বিভিন্ন প্রতারণা ও ধোঁকাকে স্পষ্ট করার জন্য সামান্য আলোচনা করা হলো।

এই আলোচনা থেকে যা বোঝা গেল

১. বর্তমান সময়ে কিছু মহল জয়ীফ হাদীস বলে হাদীসের প্রতি মুসলমানের অন্তরে যেভাবে ঘৃণা সঞ্চারের চেষ্টা করছে মূলত জয়ীফ হাদীসের বিষয়টি সেরূপ নয়। জয়ীফ আর মওজু হাদীসকে একই বিধানের অন্তর্ভুক্ত করা হাদীস জগতে বড় ধরনের খিয়ানত। মুনকিরীনে হাদীস ছাড়া এ কাজ কেউ করতে পারে না।

২. সকল মুহাদ্দিস যারা শর্তের ক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠোর থেকে কঠোর তাঁদের কাছেও বিভিন্নভাবে জয়ীফ হাদীস গ্রহণযোগ্য।

৩. জয়ীফ হাদীস শুধু ফাজায়েলে নয়, আহকামেও ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য। এমনকি আকায়েদের ক্ষেত্রে অনেকে জয়ীফ হাদীস দ্বারা দলিল গ্রহণ করেছেন।

৪. যারা জয়ীফ হাদীস গ্রহণযোগ্য নয় বলেছেন, মূলত তারা এর দ্বারা মওজু হাদীস বা তার স্তরে পৌঁছে গেছে এমন হাদীসের কথাই বলেছেন।

৫. জয়ীফ হাদীস তো নয়ই বরং মওজু হাদীসও কোনো কিতাবে উল্লেখ করা হলে তা বর্জনীয় বলে উম্মতের কেউ বলেননি।

৬. 'জয়ীফ ও মওজু হাদীস সম্বলিত কিতাব বর্জনীয়' এই নীতি গ্রহণ করা হলে দুনিয়ায় সমস্ত হাদীস, ফেকাহ এবং তাফসীরের কিতাব সম্পর্কে মুসলমানগণ আস্থা হারিয়ে ফেলবে। ইসলামের শত্রুদের উদ্দেশ্যও এটি।

সুন্নাহের ওপর আমলের মূলনীতি

উপরেও বলা হয়েছে, হাদীসসংক্রান্ত সহীহ জয়ীফের যে দীর্ঘ আলোচনা দুনিয়াতে আছে সবই মুহাদ্দিসীনের মতামত। এর কোনো দলিল কোরআন-হাদীসে নেই। কিন্তু যেহেতু বড় বড় মুহাদ্দিস ইমাম সকলে ইসলামের শাহেদে আদেল এবং তাদের ইজমা শরীয়তের দলিল তাই তাদের এসব মতামত সকলকে মানতে হবে। সেটা হলো হাদীস গ্রহণযোগ্য হওয়া না হওয়া সম্পর্কে। কিন্তু মানুষের আমলী যিন্দেগীতে হাদীস আমলযোগ্য হওয়া না হওয়া সম্পর্কে হাদীসের বিভিন্ন মূলনীতি রয়েছে। তার মধ্যে সকলের কাছে আবশ্যকীয় মূলনীতি হলো রাসূল (সা.)-এর দেওয়া মূলনীতি। রাসূল (সা.)-এর ভাষায় মুসলমানদের জন্য মডেল হলো তিন যুগ। সাহাবী, তাবেঈন, এবং তবেতাবেঈনের যুগ। এই তিন যুগে যারা রাসূল (সা.) কে অনুসরণ করেছেন, তাদের অনুসরণ পুরো উম্মতের জন্য আবশ্যক। সে ক্ষেত্রে তাদের আমলের সাথে সহীহ হাদীসের বিরোধ দেখা গেলে গ্রহণযোগ্য হবে তাদের আমল। এটিই কারণ সকল মুহাদ্দিস তাদের কাছে বিশাল হাদীস সম্ভার মওজুদ থাকা সত্ত্বেও চার ইমামের যেকোনো ইমামের অনুসারী ছিলেন। কারণ তাঁরা প্রত্যেকে রাসূল (সা.)-এর উক্ত মূলনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। কেউ হাদীসের সহীহ জয়ীফের উসূলকে প্রাধান্য দিয়ে রাসূল (সা.)-এর দেওয়া মূলনীতি থেকে সরে যাননি। ইসলামের মূল ধারা চার মাযহাব থেকে নিজেকে উর্ধ্বে বলে প্রচার করেননি। এত বড় বড় মুহাদ্দিসগণের কেউ এই উদ্যোগ নেননি যে, প্রচলিত এই চার মাযহাবকে ভেঙে সহীহ একটি মাযহাব বানানো প্রয়োজন। কেউ বলেননি, চার মাযহাব বাদ দিয়ে একমাত্র সহীহ হাদীসের ওপরই আমাদের চলতে হবে। অথচ হাদীসের সহীহ ও জয়ীফ হওয়ার উসূল তাদেরই বানানো। তাদের নিজ নিজ মূলনীতির ভিত্তিতে হাদীস আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে। আর সে কারণেই তাঁরা সকলে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অন্তর্ভুক্ত। ইসলামের মূল ধারার একেকটি সুবিশাল স্তম্ভ।

ফাজায়েলে আমালে উল্লিখিত হাদীস

ফাজায়েলে আমালের হাদীসগুলো তাখরীজ এবং তাহকীক জানার পর আমরা যদি দেখি এর বেশির ভাগ হাদীস সহীহ বা হাসান। কিছু কিছু জয়ীফ বা মওজু হাদীসও রয়েছে। এসব ব্যাপারে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ।

এখন আলোচনার বিষয় হলো, বাস্তবে যদি ফাজায়েলে আমালের অবস্থা এই হয়, তবে বোঝা যাবে অন্যান্য হাদীসের কিতাব অনুসারেই এই কিতাবের হাদীসগুলো সংকলন করা হয়েছে। হযরত শায়খ (রহ.) এ কথাও দাবি করেননি যে, ফাজায়েলে আমাল গ্রন্থে সবই সহীহ হাদীস। হাদীসের মূলনীতি অনুসারে ফাজায়েলের ক্ষেত্রে জয়ীফ হাদীস গ্রহণীয়, এটির ওপর মুহাদ্দিসগণ একমত।

এই বাস্তবতার পরও কিছু মহল থেকে এটিকে একটি পরিত্যাজ্য কিতাব বলে দাবি করা, মিডিয়াতে বসে লম্বা লম্বা কথা বলা, বড় গলায় কমেন্ট করে এ কিতাব সম্পর্কে মুসলমানদের মনে সন্দেহের বীজ বপনের অপপ্রয়াস চালানো, কথায় কথায় এই কিতাব সম্পর্কে মিথ্যারোপ করা ইত্যাদির উদ্দেশ্য কী?

এর পেছনে সক্রিয় থাকতে পারে বিভিন্ন উদ্দেশ্য। যেমন :

১. এটির মাধ্যমে মানুষ হেদায়াত পাচ্ছেন। কিন্তু উক্ত মহল হেদায়াত চান না। চান মুসলমানগণ সবাই তাদের মতো গোমরাহ হয়ে যাক।

২. ফাজায়েলে আমালের কথা বলে সকল হাদীসের কিতাব সম্পর্কে মুসলমানদের মনে সন্দেহের বীজ বপন করা। মুসলমানগণ যাতে সমস্ত হাদীসের কিতাবের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে তাদের কতিপয় গোমরাহীপূর্ণ কিতাবের ওপরই বিশ্বাস স্থাপন করে।

৩. উম্মতের সমস্ত মুহাদ্দিস, ফকীহ, মুজতাহিদ, মুফাসসির, উলামায়ে কেরামসহ ইসলামের সকল কর্ণধার সলফে সালেহীনদের সম্পর্কে মুসলমানগণের ভক্তি ও বিশ্বাস হ্রাস করা।

৪. এমনকি সাহাবায়ে কেরামের প্রতিও মুসলমানদের কঠিন ভক্তি, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও বিশ্বাসে কুঠারাঘাত করা।

৫. তাবলীগ জমাআত, যা আজ সারা দুনিয়ায় হেদায়াতের আলো চড়াচ্ছে তার প্রতি মুসলমানদের সন্দিহান করে তোলা।

৬। উলামায়ে দেওবন্দ, যারা সঠিক ইসলামের রক্ষাকবচ তাদের প্রতি মুসলমানদের ভক্তি ও শ্রদ্ধাকে নিশ্চিহ্ন করা।

৭. ইসলামকে ধ্বংস করার একটি পরিকল্পিত নীলনকশা বাস্তবায়ন করা।

মুসলমানদের আত্মবিধ্বংসী এরূপ কিছু উদ্দেশ্য ব্যতীত এহেন তোলপাড় ও সারাক্ষণ মিথ্যা প্রলাপের আর কোনো উদ্দেশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না।

ফাজায়েলে আমালের পরিপূর্ণ তাখরীজ ও তাহকীক সম্পন্ন হওয়ার পর সম্মানিত পাঠকদের কাছে এদের মুখোশ এমনিতেই উন্মোচিত হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

আমাদের আশা, এই কাজে দীর্ঘ সময় ব্যয় হলেও সুহৃদগণ আল-আবরারের পাশে থাকবেন। আল্লাহ তা'আলা সবার সহায় হোন এবং এই কাজ মকবূলিয়াতের সাথে সুসম্পন্ন হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা
শাহ আবরারুল হক্ব হক্কী হারদূয়ী (রহ.)-এর
অমূল্য বাণী

একের বিশৃঙ্খলা বেশিজনের কষ্ট :
হযরত বলেন, এক ব্যক্তির ভুল এবং বিশৃঙ্খলা অনেক সময় অনেক লোকের ক্ষতি হয়। উপকার থেকে বঞ্চিত হয় অনেকে। যেমন একজন তালেবে ইলম ভুল করল বা জেনেবুঝে খারাপ কাজ করল। এর কারণে সে মাদরাসার আইনে দণ্ডিত হলো। অনেক সময় বহিষ্কৃতও হলো। শেষ পর্যন্ত সে আলেম বা হাফেজ হতে পারল না। যদি সে আলেম হতো তবে অনেক মানুষ তার কাছ থেকে উপকৃত হতো। তার ইলমের ফয়জ হাসিল করতে পারত হাজার হাজার লোক। কিন্তু একটিমাত্র ভুলের কারণে অনেকে এই উপকার থেকে বঞ্চিত হয়ে গেল। তার এই ভুলের কারণে তার মাতা-পিতার কষ্ট হলো, কষ্ট হলো তার বন্ধুবান্ধব, ভাইবোন এবং উস্তাদদের। দেখুন, কতজনের ক্ষতি হলো এবং কতজনের কষ্ট হলো। তাই ভুল এবং গুনাহ থেকে বেঁচে থাকো। এটি ছিল একজন তালেবে ইলমের ভুল। তাতেই ক্ষতি হলো কতজনের। যদি কোনো বড় দায়িত্বশীল জিম্মাদার ভুল করে তবে চিন্তা করুন কত লোকের ক্ষতি হবে এবং কত লোক কষ্ট পাবে।

ছোটরা বড়দের আমল গ্রহণ করে :
কোনো বড়য়ের মধ্যে যদি খারাবি থাকে তা ছোটরা গ্রহণ করে। তা থেকে ছোটদের মধ্যে খারাবির চর্চা হয়। মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সবই শরীরের অংশ। শরীর হলো বড়। শরীরের মধ্যে অন্তর বড়। অন্তরের রোগের কারণে পুরো শরীর রুগ্‌ণ হয়ে যায়। অন্তরে যদি আল্লাহর ভয় এবং মুহাব্বত থাকে তবে তার সর্বপ্রকার আচার-আচরণ ঠিক হয়ে যায়। শরীরের প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তখন ভালো কাজ করে। সুতরাং অন্তরে আল্লাহর ভালোবাসা ও ভয় সৃষ্টি করা আবশ্যক।

আল্লাহর ভয় ও মুহাব্বত সৃষ্টির পদ্ধতি :
এর সহজ পদ্ধতি হলো, কষ্ট করে সুন্নাতের ওপর আমল আরম্ভ করা। আল্লাহওয়ালাদের সাহচার্যে যাওয়া। এ কারণে আমরা মাদরাসায় আসরের পর একটি নিয়ম রেখেছি। আসরের নামাযের পর মসজিদে কিছু সময় বসা হয়। তাতে আসাতেযা এবং সুলাহাদের সাহচার্যও লাভ হয়। পরস্পর আপসে বসার মধ্যেও উপকার আছে। আসরের পর মাগরিবের আগে সময়টুকুতে বুযুর্গদের কথাবার্তাও শোনানো হয়। যাতে অন্তর তৈরি হয়। অন্তর যখন ঠিক হয়ে যাবে তখন সমস্ত কাজই ঠিক হয়ে যাবে। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের চর্চা করো। পবিত্র কোরআন অন্তরকে সাজিয়ে দেয়। হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন মানুষের অন্তরে জং ধরে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, তা থেকে পরিত্রাণের পদ্ধতি কী? রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, বেশি বেশি মৃত্যুর কথা স্মরণ করো, পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করো। এটি বলার কারণ হলো, এক অন্তরের কারণে কত ক্ষতির সম্মুখীন হয় মানুষ। মানুষের আতুড়ি যখন রুগ্‌ণ হয় তখন সারা শরীর রুগ্‌ণ হয়ে যায়। সারা শরীরে তার প্রভাব বিস্তার করে। তেমনি অন্তরের রোগের অবস্থাও তাই। ধর্মীয় দিক থেকে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অন্তরের খারাবির কারণে কর্মক্ষম হয়ে পড়ে। তাই অন্তর সংশোধনের ফিকরই মুসলমানদের আসল ফিকির হওয়া চাই।

কোরআন হিফজ করা বড় নিয়ামত :
আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত অগণিত, যা গুনে পড়ে শেষ করা যাবে না। এর মধ্যে বড় একটি নিয়ামত এবং কিয়ামত পর্যন্ত বাকি থাকার মতো মুজিযা হলো পবিত্র কোরআন মানুষের অন্তরে বসিয়ে দেওয়া। অর্থাৎ হিফজ কোরআনের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কোরআনের হেফাজতের ব্যবস্থা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, আমি পবিত্র কোরআন নাযিল করেছি এবং তার হেফাজতও করব।
হেফাজত কিছু আছে উসীলার মাধ্যমে, আর কিছু আছে উসীল ছাড়া। এখানে উসীলা ঠিক করে দিয়েছেন যে, মানুষকে কোরআন পড়ার, পড়ানোর এবং হিফজ করার হুকুম দিয়ে দিয়েছেন। মানুষের অন্তরে আল্লাহ তা'আলা এই যোগ্যতাও দান করেছেন যে, পবিত্র কোরআন সংরক্ষণ করতে পারবে। পবিত্র কোরআনের তেলাওয়াত সংরক্ষণ করবে, এর আমল সংরক্ষণ করবে। তাই এটি বড় নিয়ামত।

পবিত্র কোরআনের ওপর আমলকারীর ফযিলত :
যার অন্তরে পবিত্র কোরআন সংরক্ষিত হয়েছে যদি তার আমল উক্ত কোরআন মোতাবেক না হয় তবে তাহবে বড় মাহরূমী। যে লোক পবিত্র কোরআন হিফজ করবে এবং আমলও পবিত্র কোরআন মোতাবেক করবে তার জন্য বড় পুরস্কার রয়েছে। সে নিজের দশ জন আত্মীয়স্বজনকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। নিজেও জান্নাত লাভ করবে। চিন্তা করে দেখুন, পবিত্র কোরআন কত বড় নিয়ামত।

মাওয়ায়েযে

হযরত ফকীহুল মিল্লাত (দামাত বারাকাতুহুম)

বিভিন্ন পরিসরে প্রদত্ত হযরতের বয়ান থেকে সংগৃহীত

মীলাদুন্নবী (সা.) পালনের সঠিক পদ্ধতি

কোরআন-সুন্নাহর পর্যালোচনায় দেখা যায়, আল্লাহ তা'আলা কিছু ইবাদতকে তারিখের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন আর কিছু ইবাদতকে জুড়ে দিয়েছেন দিনের সঙ্গে। তারিখের সঙ্গে সম্পৃক্ত ইবাদতের ক্ষেত্রে দিন কোনটি হচ্ছে, তা দেখার বিষয় নয়। নির্দিষ্ট তারিখেই সেই ইবাদত পালিত হবে, যেকোনো দিনে তা হতে পারে। যেমন হজের নির্ধারিত তারিখ হচ্ছে ৯ জিলহজ। সর্বদা ওই তারিখেই হজ পালিত হবে, তবে বার হিসেবে যেকোনো দিন হতে পারে। তদ্রূপ রোজার সম্পর্কও তারিখের সঙ্গে। রমাজানের প্রথম তারিখ থেকে রোজা শুরু হবে। এতে দিনের হিসাব ঠিক থাকবে না। সপ্তাহের যেকোনো দিন রমাজানের প্রথম তারিখ হতে পারে। ঠিক প্রতি চান্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের নফল রোজার ব্যাপারটিও। তারিখের সঙ্গে এসব ইবাদত সম্পৃক্ত, দিনের সঙ্গে নয়।

পক্ষান্তরে কিছু ইবাদত রয়েছে দিনের সঙ্গে সম্পৃক্ত, যেখানে তারিখ কোনটি, তা দেখার বিষয় নয়। নির্দিষ্ট দিনেই তা পালন করতে হবে, তারিখ যা-ই হোক না কেন। যেমন শুক্রবারের বিভিন্ন আমল। যার মধ্যে রয়েছে ফজরের নামাজের প্রথম রাক'আতে সূরায়ে আলিফ লা-ম মী-ম সিজদার ও দ্বিতীয় রাক'আতে সূরায়ে দাহর-এর তিলাওয়াত। উত্তমরূপে গোসল করে সকাল সকাল মসজিদে যাওয়া, সূরা কাহাফের তিলাওয়াত, আসর নামাজের পর স্থান ত্যাগের আগে ৮০ বার বিশেষ দরূদ শরিফ পাঠ করা এবং সূর্যাস্তের পূর্বমুহূর্তে মহান আল্লাহর দরবারে দু'আ মুনাজাত করা ইত্যাদি। এগুলো শুক্রবার দিনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ইবাদত। তারিখের সেখানে কোনো ধর্তব্য নেই। মাসের যেকোনো তারিখ হতে পারে। কোনো মাসে চারটি শুক্রবার হবে, আবার কোনো মাসে পাঁচটি।

দিনের সঙ্গে সম্পৃক্ত আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হচ্ছে সোমবারের রোজা। প্রতি সপ্তাহের এই দিনে নফল রোজা রাখার অনেক ফজিলত রয়েছে। দিন হিসেবে এটা পরিপালিত হয়ে থাকে, তারিখ দেখে নয়। হাদীস শরীফে এসেছে,

নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে সোমবারের রোজা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'এই দিনে আমি জন্মগ্রহণ করেছি এবং এই দিনে আমাকে নবুয়াত দান করা হয়েছে।' (মুসলিম : ১১৬২)

মুসলিম শরীফে বর্ণিত বিশুদ্ধ এই হাদীস দ্বারা মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর জন্মদিনে উম্মতের করণীয় কী, তা নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

অন্য হাদীসে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, সোমবার ও বৃহস্পতিবার বান্দার আমলনামা আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয়ে থাকে। অতএব রোজা অবস্থায় আমার আমলনামা পেশ করা হোক, এটা আমি পছন্দ করি। (তিরমিজি : ৭৪৭)

নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জন্মের কারণে বছরের প্রতিটি সোমবার অতি মূল্যবান হয়ে গেছে। তাই এই দিনে নফল রোজার বিধান রাখা হয়েছে। এই দিনে রোজা রাখা প্রকৃত নবীপ্রেমের বহিঃ প্রকাশ হিসেবে গণ্য হবে।

সোমবার নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জন্মদিন, এটা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। পক্ষান্তরে ১২ রবিউল আউয়াল তাঁর পবিত্র জন্মদিন হওয়ার কথা কোরআনেও নেই, হাদীসেও নেই। ঐতিহাসিকরাও ১২ তারিখে জন্মের বিষয়টি নিশ্চিত করতে পারেননি। প্রকৃতপক্ষে সোমবারই হচ্ছে তাঁর পবিত্র জন্মদিন, এটা নিশ্চিত করে বলা যায়। এ ক্ষেত্রে তারিখ দেখার বিষয় নয়, ১২ তারিখও হতে পারে, ভিন্ন তারিখও হতে পারে।

প্রকৃত নবীপ্রেমিক হতে হলে প্রতি সোমবার রোজা রাখা চাই। সঙ্গে বৃহস্পতিবারও রাখা উচিত। বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা এগুলো প্রমাণিত। এর বিপরীত দিনের প্রতি লক্ষ না করে তারিখের ভিত্তিতে ১২ তারিখকে জন্মদিন ধরে নিয়ে জশনে-জুলুস বা মিছিল বের করা একটি মনগড়া কাজ বৈ কিছু নয়। ইসলামের সঙ্গে এসব জশনে-জুলুসের ন্যূনতম কোনো সম্পর্ক নেই। কেননা ইসলামের স্বর্ণযুগে এমন মিছিলের বা জন্মদিন পালনের প্রথা খুঁজে পাওয়া যায় না। নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র যুগে জশনে-জুলুস বা জন্মদিন পালনের নিয়ম ছিল না। পরবর্তী সময়ে খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগেও পালিত হয়নি। সাহাবাদের যুগেও কেউ পালন

করেননি। চার ইমামসহ মুহাদ্দিসীনের কেউ তা পালন করেননি। বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানি (রহ.), খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতি আজমীরি (রহ.), শাহজালাল ইয়ামেনি (রহ.)-এর মতো বুযুর্গদের কেউ তা পালন করেননি।

তাই আসুন, প্রকৃত নবীপ্রেমের বহিঃপ্রকাশ করতে আমরা প্রতি সোমবার নফল রোজা রাখার অভ্যাস গড়ে তুলি। রোজা অবস্থায় আল্লাহর দরবারে আমাদের আমলনামা পেশ করার সৌভাগ্য অর্জন করি। যদি সময়-সুযোগের অভাবে বা অন্য কোনো কারণে সারা বছর এ রোজা পালনের তাওফিক না হয়, তবে কমপক্ষে রবিউল আউয়াল মাসে এ ইবাদতটি আমরা পালন করতে পারি। হয়তো চারটি রোজা রাখা লাগবে। এতে নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আদর্শ বাস্তবায়িত হবে। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, 'যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে।' (সূরা আল আহযাব : ২১)

অতএব রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আদর্শ মোতাবেক প্রতিটি ইবাদত পালন একজন নবীপ্রেমিক বান্দার একান্ত কাম্য হওয়া উচিত।

আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে সুস্থ ও সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে এগিয়ে যাবে আল-আবরার

নিউ রূপসী কার্পেট

সকল ধরনের কার্পেট বিক্রয় ও সরবরাহের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

স্বত্বাধিকারী : হাজী সাইদুল কবীর

৭৩/এ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।
ফোন : ৮৬২৮৮৩৪, ৯৬৭২৩২১

বি.দ্র. মসজিদ মাদরাসার ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ থাকবে

চশমার জগতে যুগ যুগ ধরে বিখ্যাত ও বিশ্বস্ত

মেহবুব অপটিক্যাল কোং

এখানে অত্যাধুনিক মেশিনের সাহায্যে চক্ষু পরীক্ষা করা হয়।
পাইকারি ও খুচরা দেশি-বিদেশি চশমা সুলভ মূল্যে বিক্রি করা হয়।

১২ পাটুয়াটুলি রোড, ঢাকা ১১০০
ফোন : ০২- ৭১১৫৩৮০ , ০২- ৭১১৯৯১১

১৩ গ্রীন সুপার মার্কেট, গ্রীন রোড, ঢাকা-১২১৫। ফোন : ০২-৯১১৩৮৫১

খতমে নবুওয়াত ও কাদিয়ানী মতবাদ

মাওলানা মুফতী মনসূরুল হক্ব

কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

এ দলের প্রতিষ্ঠাতা হলেন মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী। তিনি ১৮৩৯/৪০ খ্রিস্টাব্দে পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার কাদিয়ান অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা নিজ এলাকাতেই লাভ করেন। লেখাপড়া সমাপ্ত করে পাঞ্জাবের এক অফিসে কেরানির চাকরি গ্রহণ করেন। পূর্ব থেকেই তাঁর পরিবার ইংরেজদের তল্পীবাহক হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিল। গোলাম আহমাদ প্রাথমিক পর্যায়ে নিজেকে একজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি হিসেবে প্রকাশ করেন। কিন্তু পরবর্তীতে ইংরেজদের প্রকাশ্য দালালিতে লিপ্ত হন এবং বিভিন্ন মিথ্যা দাবির মাধ্যমে মুসলমানদের বিভ্রান্ত ও ঈমানহীন বানানোর চক্রান্ত শুরু করেন। কখনো তিনি নিজেকে মূলহাক (যার অন্তরে দৈব বাণী অবতীর্ণ হয়) বলে দাবি করেন। কখনো মুহাদ্দাস (আল্লাহ যার সাথে অন্তরে অন্তরে কথা বলেন) দাবি করেন। কখনো দাবি করেন তিনিই প্রতিশ্রুত ঈসা মসীহ। পরিশেষে নিজেকে সর্বশেষ নবী দাবি করে চূড়ান্ত মিথ্যার অবতারণা করেন। তাঁর এমন একের পর এক জঘন্য ভ্রান্ত দাবি এবং বিভিন্ন কুফুরী মতবাদ প্রকাশ হয়ে পড়লে তার আসল চেহারা ফাঁস হয়ে যায় এবং সমস্ত হক্কানী আলেম-উলামা তাঁকে মুরতাদ ও বেঈমান ফতওয়া দেন।

মির্জা গোলাম আহমাদের কিছু ভ্রান্ত আক্বীদা ও তার খণ্ডন

আল্লাহ সম্পর্কে আক্বীদা

কাদিয়ানীর বক্তব্য–আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমিই আল্লাহ। (আয়েনায়ে কামালাতে মির্জা- ৫৬৪, ৫৬৫/কাদিয়ানী মাযহাব- ৩২৮)

খণ্ডন : কোরআনে কারিমে ইরশাদ হয়েছে, 'আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারক, তাঁকে তন্দ্রা অথবা নিদ্রা স্পর্শ করে না। (সূরা বাকারা- ২৫৫) সুতরাং ঘুমের মধ্যে আল্লাহ হওয়ার স্বপ্ন দেখাটা তার মিথ্যুক হওয়ারই প্রমাণ বহন করে।

কাদিয়ানীর বক্তব্য : আল্লাহ তাকে বলেছেন, শোন! হে আমার ছেলে। (গোলাম আল বুশরা- ১/৪৯, ইসলামী আক্বীদা ও ভ্রান্তমতবাদ- ৩০৮)

খণ্ডন : অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি। (সূরা ইখলাস- ৩) আরও দেখুন সূরা নিসা- ১৭১, সূরা ইউনুস- ৬৮)

হাদীসে কুদসীতে আছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন : 'বনী আদম আমার ওপর মিথ্যারোপ করেছে, অথচ তার এরূপ করার কোনো অধিকার নেই এবং সে আমাকে গালি দিয়েছে, অথচ তার এরূপ করার কোনো অধিকার নেই। আর আমার ওপর মিথ্যারোপ করাটা এভাবে যে, সে বলে- তিনি আমাকে যেভাবে সৃষ্টি করেছেন, সেভাবে কিছুতেই পুনরুত্থিত করতে পারবেন না। আর আমাকে গালি দেয়াটা এভাবে যে, সে বলে আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন; অথচ আমি নির্মুখাপেক্ষী। আমার কোনো সন্তান নেই এবং আমিও কারও সন্তান নই। আর আমার কোনো সমকক্ষ নেই। (বুখারী শরীফ- ৪৯৭৪, নাসাঈ শরীফ- ২০৭৮)

(২) রাসূলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম সম্পর্কে আক্বীদা :

কাদিয়ানীর বক্তব্য : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সর্বশেষ নবী নন; বরং গোলাম আহমাদ সর্বশেষ নবী। (হাকীকাতুন নবুয়াত- ৮২, তিরইয়াকুল কুলূব- ৩৭৯, আদইয়ানে বাতেলা আওর সিরাতে মুস্তাকীম- ১৩২)

গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে অধিক মর্যাদাবান। (হাকীকুতুন নাবুয়াত পৃ. ২৭২, আরবাঈন পৃ. ৩০৮, আদইয়ানে বাতেলা পৃ. ১৩২, ইসলামী আকীদা পৃ. ৩০৮)

খণ্ডন : অথচ কোরআনে এসেছে- 'মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তোমাদের কারো পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং সর্বশেষ নবী। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।' (সূরা আহযাব- ৪০)

হাদীসে এসেছে- শীঘ্রই আমার উম্মতের মাঝে ৩০ জন মিথ্যুকের আবির্ভাব ঘটবে। তারা প্রত্যেকেই অমূলক দাবি করবে যে, সে আল্লাহর নবী; অথচ আমিই মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সর্বশেষ নবী। আমার পরে কোনো নবী নেই। (আবূ দাউদ- ২/২২৮, তিরমিযী- ২/৪৫, বুখারী- ৩৫৩৫, মুসলিম- ২২৮৬)

কোরআনে এসেছে- 'সমস্ত নবীদের থেকে আল্লাহ তা'আলা এ অঙ্গীকার নিয়েছেন যে, তোমরা যদি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যামানা পাও তাহলে তোমরা অবশ্যই

তাঁর প্রতি ঈমান আনবে এবং তাঁকে সাহায্য করবে।' (আলে ইমরান-৮১)

উক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়, নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সকল নবীদের মাঝে শ্রেষ্ঠ। আর গোলাম আহমাদ তো একজন বেঈমান, মুরতাদ ও কাফের। নবী তো দূরের কথা, একজন সাধারণ মুসলমানও নয়।

কোরআনে বিশ বারেরও অধিক রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে সম্বোধন করা হয়েছে; কিন্তু মির্জা কাদিয়ানীর দাবি হলো, এসব স্থানে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে নয়; বরং তাকে সম্বোধন করা হয়েছে। (দাফেউল বালা-১৩, ইজাযে আহমাদী-১১/২৯১)

এমন মিথ্যাচারীদের সম্পর্কে কোরআনে এসেছে, 'তোমরা আল্লাহর সম্বন্ধে মিথ্যা বলতে ও তার নির্দেশ সম্বন্ধে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করতে, সে কারণে আজ তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি প্রদান করা হবে। (সূরা আনআম-৯৩)

কোরআন শরীফে নবীজিকে করা সম্বোধন নিজের দিকে সম্পৃক্ত করে কাদিয়ানী সাহেব যেন নিজেকে উক্ত আয়াতের ক্ষেত্র সাব্যস্ত করেছেন।

(৩) ঈসা (আ.) ও অন্য নবীদের বিষয়ে আক্বীদা

কাদিয়ানীর বক্তব্য : ঈসা (আ.)-এর তিনটি ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। (ইজাযে আহমাদী, পৃ. ১৪, আদইয়ানে বাতেলা, পৃ. ১৩৩)

খণ্ডন : অথচ কোরআনে এসেছে, 'আল্লাহ অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী আর কে হতে পারে? (সূরা নিসা- ৮৭)

আর নবীগণ যা কিছু বলেন আল্লাহর হুকুমেই বলেন। অতএব নবীদের ভবিষ্যদ্বাণী কখনো মিথ্যা হতে পারে না। সুতরাং কাদিয়ানীর ঈসা (আ.)-এর তিনটি ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হওয়ার দাবি করা পরোক্ষভাবে এ কথারই দাবি করা যে, আল্লাহ মিথ্যা বলেছেন। (নাউযুবিলাহ্)

কাদিয়ানীর বক্তব্য : হয়রত ঈসা (আ.) মৃত্যুবরণ করেছেন। তিনি কিয়ামতের পূর্বে আগমন করবেন না। (ইযালায়ে কুলাঁ- ২/৩১১, আদইয়ানে বাতেলা-১৩৪)

খণ্ডন : অথচ কোরআনে এসেছে- 'কাফিররা বলে থাকে, আমরা আল্লাহর রাসূল মারইয়াম তনয় ঈসা মাসীহকে হত্যা করেছি। আসলে তারা তাঁকে হত্যা করেনি; বরং তাদের বিভ্রম হয়েছিল। তারা নিশ্চয় এ বিষয়ে সংশয়যুক্ত ছিল। এ ক্ষেত্রে অনুমানের অনুসরণ ব্যতীত তাদের কোনো জ্ঞানই ছিল না। এটা নিশ্চিত যে, তারা তাঁকে হত্যা করেনি; বরং আল্লাহ তাঁকে আসমানে নিজের কাছে উঠিয়ে নিয়েছেন এবং আল্লাহ যবরদস্ত শক্তিমান ও হিকমতওয়ালা'। (সূরা নিসা-১৫৭)

হাদীসে এসেছে, নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, অচিরেই তোমাদের মাঝে একজন ন্যায়পরায়ণ বাদশাহরূপে মারইয়াম তনয় ঈসা (আ.)-এর আগমন ঘটবে .... (বুখারী শরীফ-৩৪৪৮)

কাদিয়ানীর বক্তব্য : 'মির্জা সাহেব বনী ঈসরাঈলের নবীদের চেয়ে উত্তম।' (দাফেউল বালা-২০)

খণ্ডন : অথচ সর্বসম্মত আক্বীদা হলো, কোনো মুমিন চাই সে যত বড় বুযুর্গ হোক না কেন, কোনো নবীর চেয়ে অধিক মর্যাদাবান হতে পারে না। (শরহে আকায়েদ-১৬১) তাহলে মির্জা সাহেব যিনি সাধারণ মুমিন তুল্যও নন, তিনি কিভাবে বনী ইসরাঈলের নবীদের উর্ধ্বে মর্যাদাসম্পন্ন হতে পারেন?

(৪) ফেরেশতা সম্পর্কে আক্বীদা

কাদিয়ানীর বক্তব্য : ফেরেশতা বলতে কিছু নেই। (তাওযীহে মারাম-২৯, আদইয়ানে বাতেলা-১৩৩)

খণ্ডন : অথচ কোরআনে এসেছে- 'আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, নিশ্চয় তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। ফেরেশতাগণ এবং জ্ঞানীরাও একই সাক্ষ্য দেন... (আলে ইমরান-১৮, সূরা বাকারা-৩০, ১৬১, সূরা নিসা-৯৭)

ঈমানে মুফাস্সালের মধ্যেও ফেরেশতাদের ওপর ঈমান আনার ঘোষণা করা হয়েছে। তাছাড়া চারজন বড় বড় ফেরেশতার নাম কার অজানা? সুতরাং একমাত্র বেঈমান ব্যতীত অন্য কেউ ফেরেশতাদেরকে অস্বীকার করতে পারে না।

(৫) জিহাদ সম্পর্কে আক্বীদা

কাদিয়ানীর বক্তব্য : 'জিহাদের হুকুম রহিত হয়ে গেছে।' (হাশিয়ায়ে আরবাঈন-১৫৪, আদইয়ানে বাতেলা-১৩৩)

খণ্ডন : অথচ কোরআনে এসেছে- 'তোমরা তাদের (কাফিরদের) বিরুদ্ধে জিহাদ করতে থাকো, যতক্ষণ না ফিতনা (কুফরী কর্মকাণ্ড) দূরীভূত হয়...' (সূরা আনফাল-৩৯, আরো দেখুন, সূরা আনকাবূত-৬৯, হুজুরাত-১৫, ফুরকান-৫২)

(৬) হাশর সম্পর্কে আক্বীদা

কাদিয়ানীর বক্তব্য : 'মৃত্যুর পর হাশরের ময়দানে কেউ একত্র হবে না; বরং সরাসরি জান্নাত বা জাহান্নামে প্রবেশ করবে।' (ইযালায়ে আহকামে কুলাঁ-১৪৪, আদইয়ানে বাতেলা-১৩৩)

খণ্ডন : অথচ আল্লাহ বলেন, 'স্মরণ করো! যেদিন তাদের সকলকে একত্র করব। মুশরিকদের বলব, যাদেরকে তোমরা আমার শরীক মনে করতে তারা কোথায়? (সূরা আনআম-২২, আরো দেখুন, কাহাফ-৪৭, ফাতিহা-৩)

এ ছাড়া অসংখ্য হাদীসে হাশরের ময়দানের আলোচনা আছে যেমন- বোখারী শরীফ ১ম খণ্ড বাবুস সুজূদ।

মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর আরো কিছু ভ্রান্ত আক্বীদা

কাদিয়ানীর বক্তব্য : যে ব্যক্তি মির্জার নবুওয়াত মানে না সে জাহান্নামী কাফের। (রবয়ীন-৪, আদইয়ানে বাতেলা-১৩২)

খণ্ডন : অথচ সমগ্র দুনিয়ার উলামায়ে কেরামের ফাতাওয়া হলো, যে মির্জাকে নবী মানবে সে কাফের।

কাদিয়ানীর বক্তব্য : তাঁর দাবি হলো, তিনি মুজাদ্দিদ। (আয়েনায়ে কামালাতে ইসলাম-৪২৩, ইসলামী আক্বীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ : ৩২৬)

খণ্ডন : মুজাদ্দিদ তো ওই মহান ব্যক্তিকে বলা হয়, যিনি যুগের মানুষের হেদায়াতের আলোকবর্তিকা হন। কাদিয়ানী সাহেব–যিনি বিভিন্ন কুফরী মতবাদের কারণে নিজেই ঈমানহারা এবং অসংখ্য মানুষকে ভ্রষ্টকারী তিনি কিভাবে মুজাদ্দিদ হতে পারেন। অবশ্য তাকে গোমরাহীর মুজাদ্দিদ বলা যেতে পারে।

কাদিয়ানীর বক্তব্য : তিনি দাবি করেছেন, তাঁর ওপর ২০ পারার মতো কোরআন নাযিল হয়েছে। (হাকীকাতুল ওহী-৩৯১, ইসলামী আক্বীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ-৩২৭)

খণ্ডন : অথচ নবী বা রাসূল ছাড়া কারো ওপর আসমানী ওহী নাযিল হতে পারে না। তবে কাদিয়ানী সাহেবের 'মুনীব' ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক প্রাপ্ত নির্দেশগুলোকে হয়তো তিনি ওহী মনে করেছেন।

কাদিয়ানীর বক্তব্য : তাঁর দাবি মতে, তিনি হিন্দুদের শ্রীকৃষ্ণ অবতার। (কাদিয়ানী মাযাহাব-৪৩২, ইসলামী আক্বীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ-৩২৮)

খণ্ডন : তিনি যদি হিন্দুদের শ্রীকৃষ্ণ হয়ে থাকেন তাহলে হিন্দুদের অনুসারী হওয়াই তাঁর জন্য শ্রেয় ছিল। তাহলে তিনি মুসলমানদের ঈমান ধ্বংস করার অপচেষ্টায় মেতে উঠলেন কেন? সুতরাং উক্ত দাবি দ্বারা তার কাফির হওয়াই স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়।

কাদিয়ানীর বক্তব্য : তিনি হলেন যুলকারনাঈন। (বারাহীনে আহমদিয়া-৯৭, ইসলামী আক্বীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ-৩২৯)

খণ্ডন : অথচ কোরআনে বর্ণিত যুলকারনাঈন তো বহু যুগ পূর্বে বিগত হয়েছেন।

উল্লেখ্য, তিনি মিথ্যা নবী না হলে বেইজ্জতির মৃত্যু কামনা করতেন না এবং তাঁর জীবনে সেটি বাস্তবায়িতও হতো না। এটাও তাঁর মিথ্যাবাদী হওয়ার জলন্ত প্রমাণ। এ ছাড়া মুহাম্মাদী বেগমসহ বিভিন্ন ব্যাপারে তিনি অসংখ্য ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, যার সবগুলো পরবর্তীতে মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছে। অথচ নবীদের কোনো অঙ্গীকারও কখনো মিথ্যা প্রমাণিত হয়নি।

কাদিয়ানী সাহেবের এ সকল মিথ্যা দাবি ও ভ্রান্ত আক্বীদার পরিপ্রেক্ষিতে প্রথমে লুধিয়ানার আলেমগণ, অতঃপর দারুল উলুম দেওবন্দের উলামাগণ তাকে কাফের বলে ফাতওয়া প্রদান করেন। পরবর্তিতে ১৪৪টি মুসলিম রাষ্ট্রের সংগঠন রাবেতা আলমে ইসলামীর সম্মেলনের পক্ষ হতে সর্বসম্মতভাবে তাকে এবং তার অনুসারীদেরকে কাফের ঘোষণা করা হয়। এ ছাড়া ১৯৮৮ সালে ওআইসির উদ্যোগে আয়োজিত এক সম্মেলনে সকল মুসলিম দেশের ধর্মমন্ত্রীদের কাছ থেকে তাঁকে ও তাঁর অনুসারীদেরকে কাফের ঘোষণা করার লিখিত প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়। সুতরাং প্রায় সকল মুসলিম দেশের পক্ষ থেকে কাদিয়ানী সম্প্রদায়কে অমুসলিম ঘোষণা করা হয়েছে। (ইসলামী আক্বীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ-৩৩২)

অতএব, এ সম্প্রদায়ের সাথে কোনো রকম সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধন সৃষ্টি করা সকল মুসলমানদের জন্য নাযায়েজ ও হারাম।

মুহাম্মাদ (সা.) সারা বিশ্বের জন্য প্রেরিত সর্বশেষ নবী; তাওরাত-ইঞ্জিল ও আল-কোরআনের আলোকে

ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান ভাইয়েরা মনে করে মুসা ও ঈসা (আ.) শেষ নবী। তাই তারা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আনীত ধর্ম ইসলাম মানছে না। অথচ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ই শেষ নবী, এ কথা যেমন কোরআনে বলা হয়েছে, তেমনিভাবে তাওরাত-ইঞ্জিলেও বলা হয়েছে। আমরা আল-কোরআন ও তাওরাত-ইঞ্জিল থেকে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শেষ নবী হওয়ার প্রমাণ উল্লেখ করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ। আমরা আশা করি, সত্যপ্রেমী ইয়াহুদী-খ্রিস্টান ভাইয়েরা সত্য গ্রহণ করতে দ্বিধা করবে না।

আল-কোরআন থেকে : হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বিশ্বনবী ও সর্বশেষ নবী হওয়া সম্পর্কে আল-কোরআনের কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা হচ্ছে :

১.'হে নবী! আপনি বলুন, হে লোকসকল! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সকলের জন্য প্রেরিত রাসূল।' (সূরা আরাফ : ১৫৮)

২. 'আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য (জান্নাতের) সুসংবাদদাতা ও (জাহান্নামের আযাবের ব্যাপারে) সর্তককারীরূপে প্রেরণ করেছি।' (সূরা সাবা : ২৮)

৩. 'পরম কল্যাণময় তিনি যিনি তাঁর বান্দা (মুহাম্মাদ সা.)-এর ওপর ফয়সালার গ্রন্থ (আল-কোরআন) নাযিল করেছেন, যাতে করে তিনি বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হন।' (সূরা ফুরকান : ১)

৪. 'তিনিই তাঁর রাসূলকে হোদায়েত ও সত্য ধর্মসহ পাঠিয়েছেন, যাতে এ ধর্মকে অন্য সমস্ত ধর্মের ওপর জয়যুক্ত করেন। সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।' (সূরা ফাতাহ : ২৮)

৫. 'মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর সহচরগণ কাফেরদের বিরুদ্ধে কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল।' (সূরা ফাতাহ : ২৯)

৬. 'মুহাম্মাদ তোমাদের কোনো পুরুষের পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসূল ও সর্বশেষ নবী। আল্লাহ সব বিষয়ে জ্ঞাত।' (সূরা আহযাব : ৪০)

এসব আয়াত থেকে আল-কোরআনের আলোকে এ কথা সুপ্রমাণিত হলো যে, মুহাম্মাদই (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সারা বিশ্বের মানুষের জন্য নবী এবং তিনিই সর্বশেষ নবী। অতএব, পরকালে চিরমুক্তির জন্য ইয়াহুদী-খ্রিস্টানসহ অন্য সমস্ত ধর্মাবলম্বীদের জন্য ইসলামের নবী, বিশ্ব মানবতার নবী, সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে মানতে হবে। তাঁর আনীত আদর্শকে নিজের জীবনের আদর্শরূপে গ্রহণ করতে হবে।

তাওরাত-ইঞ্জিলের আলোকে মুহাম্মাদ (সা.)

নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে অনেক আলোচনা হয়েছে। স্বয়ং কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে, 'যারা অনুসরণ করবে উম্মী রাসূলের যাঁর কথা তারা লিপিবদ্ধ পেয়ে থাকে তাওরাত ও ইঞ্জিলে।' (সূরা আনআম : ১৫৭) অন্য আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে : 'স্মরণ করো, যখন মারিয়াম তনয় ঈসা বলেছিল, হে বনী ইসরাঈল! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের প্রতি প্রেরিত রাসূল, আর এমন রাসূলের আগমনের সুসংবাদবাহক যিনি আমার পরে আগমন করবেন, তাঁর নাম হবে আহমাদ।' (সূরা সাফ)

তাওরাত-ইঞ্জিলে যেহেতু শেষ নবীর আগমনের সুসংবাদ ছিল, তাই ইয়াহুদী-খ্রিস্টানরা অধীর আগ্রহে শেষ নবীর আগমনের প্রতীক্ষায় ছিল। কিন্তু তারা আশা করছিল যে, বনী ইসরাঈল থেকেই শেষ নবীর আগমন ঘটবে। যখন তা হলো না; বরং বনী ইসমাঈল থেকে শেষ নবীর আগমন ঘটল তখন তারা জেদেরবশে জেনেশুনে শেষ নবীকে অস্বীকার করল। তাদের এই আচরণের কথাও কোরআনে বর্ণিত হয়েছে। বর্ণিত হচ্ছে : 'যখন তাদের (ইয়াহুদী-খ্রিস্টান) কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাব (কুরআন) এসে পৌঁছল, যা সে বিষয়ে সত্যায়ন করে যা তাদের কাছে রয়েছে এবং তারা পূর্বে ভবিষ্যৎ রাসূলের দোহাই দিয়ে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভের দু'আ করত, যখন তাদের কাছে সেই পূর্বপরিচিত কিতাব এল, তখন তারা সেটাকে অস্বীকার করল। এসব কাফেরদের ওপর আল্লাহ তা'আলার অভিশম্পাত।' (সূরা বাকারা : ৮৯) অন্যত্র বর্ণিত হচ্ছে : 'আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি (ইয়াহুদী-খ্রিস্টান) তারা তাঁকে (শেষ নবীকে) চিনে যেমনভাবে চিনে আপন সন্তানদেরকে।'। (সূরা বাকারা : ১৪৬)

এখন তাওরাত-ইঞ্জিল থেকে মুহাম্মাদ (সা.)-এর সম্পর্কে কিছু ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ করা হচ্ছে

১. হযরত মূসা (আ.) বলেন, 'মাবূদ তূর পাহাড় হতে আসলেন, তিনি সেয়ীর থেকে তাদের ওপর আলো দিলেন, তাঁর আলো পারণ পাহাড় থেকে ছড়িয়ে পড়ল।' (দ্বিতীয় বিবরণ : ৩৩/১-৩)

উপরিউক্ত উদ্ধৃতিতে 'তাঁর আলো পারণ পর্বত হতে ছড়িয়ে পড়ল' বলে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওপর ওহী নাযিল হওয়া এবং বিশ্ব মানবের পথনির্দেশকারী আল-কোরআনের কথা বোঝানো হয়েছে। এখানে 'পারণ পর্বত' বলে মক্কার পর্বত শ্রেণীকে বোঝানো হয়েছে। হেরা পাহাড় ওই সব পর্বত শ্রেণীরই অংশ। কেননা বাইবেলের ভাষ্যকার সকলেই একমত যে, এখানে 'পারণ' বলে ওই স্থানকেই বোঝানো হয়েছে যে স্থানে হযরত হাজেরা ও হযরত ইসমাঈল বসবাস করতেন বলে আদি কিতাবে উল্লেখ পাওয়া যায়।

২. হযরত মূসা (আ.) বলেন, 'যত দিন না শীলো আসেন এবং সমস্ত জাতি তাঁর হুকুম মেনে চলে, তত দিন রাজদণ্ড এহুদারই বংশে থাকবে। আর তার দুই হাঁটুর মাঝখানে থাকবে বিচার দণ্ড'। (আদি পুস্তক : ৪৯/১০)

উক্ত পদে 'শীলো' বলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কেই বোঝানো হয়েছে। কেননা ১৬২৫, ১৮২২, ১৮৩১ ও ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে মুদ্রিত বাইবেলের আরবী অনুবাদে 'শীলো' শব্দের অনুবাদ করা হয়েছে الذى له الكل 'যার জন্য সব কিছু'। এ গুণটিও নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্যই খাটে। তিনি যেহেতু সকল নবী-রাসূলের সর্দার ছিলেন, তাই সব কিছু তাঁর জন্য হওয়াটাই স্বাভাবিক। তিনি নিজে বলেছেন : 'আমি আদম সন্তানদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, এতে অহংকারের কিছু নেই।' (ইবনে মাজাহ হা .নং ৪৩০৮)

উক্ত পদে বলা হয়েছে, 'সমস্ত জাতি তাঁর হুকুম মেনে চলবে।' এ কথাটি একমাত্র নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়। কারণ, তিনিই সকল জাতির নবী, যা ইতিপূর্বে উল্লিখিত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। উক্ত পদ দ্বারা আরেকটি বিষয় স্পষ্ট বোঝা যায় যে, শীলোর আগমন হলে ইহুদীদের রাজত্ব ও জাতীয় প্রভাব-প্রতিপত্তি বিলুপ্ত হয়ে যাবে। নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আগমনের পরে বাস্তবেই ইহুদীরা রাজত্ব হারিয়ে ছিল। 'আর রিসালাতুল হাদিয়া' নামক গ্রন্থে ইহুদী পণ্ডিত আব্দুস সালাম ইসলাম গ্রহণের পর উপরে আলোচিত বিষয়টিই বিভিন্ন যুক্তি প্রমাণের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন।

৩. হযরত মূসা (আ.) বলেন, 'মাবূদ আমাদের বলেছিলেন, তারা ভালোই বলেছে। আমি তাদের ভাইদের মধ্য থেকে তোমার মতো একজন নবী দাঁড় করাব। তার জবান দিয়েই আমি আমার বক্তব্য পেশ করব। আর আমি তাকে যা বলার নির্দেশ করব, তিনি তাই তাদেরকে বলবেন। তিনি আমার নাম করে যে কথা বলবেন কেউ যদি আমার সে কথা না শোনে আমি নিজেই সে লোককে দায়ী করব। পক্ষান্তরে আমি বলিনি এমন কোনো কথা, যদি কোনো নবী আমার নাম করে বলতে দুঃসাহস

করে কিংবা সে যদি দেব-দেবীর নামে কথা বলে, তবে তাকে হত্যা করতে হবে। কোনো একটা কথা সম্পর্কে তোমরা মনে মনে বলতে পারো, মাবূদ এ কথা বলেছেন কি না তা আমরা কী করে জানব? কোনো নবী যদি মাবূদের নাম করে কথা বলে, আর তা যদি অসত্য হয় কিংবা না ঘটে, তবে বুঝতে হবে সে কথা মাবূদ বলেননি, সেই নবী দুঃসাহস করে ওই কথা বলেছে। তাকে তোমরা ভয় করো না। (দ্বিতীয় বিবরণ : ১৮/১৭-২২)

এখানে উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণী আখেরী নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কেই খাটে। কেননা উক্ত বাণীতে 'তাদের ভাইদের মধ্য হতে একজন নবী দাঁড় করাব।' এখানে 'তাদের বলে' বনী ইসরাঈলকে বোঝানো হয়েছে। আর বনী ইসরাঈলের ভাই হলো বনী ইসমাঈল। আদি পুস্তকের ১৬-এর ১২-তেও বনী ইসমাঈলকে বনী ইসরাঈলের ভাই হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আর এ কথা সবাই জানে যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বনী ইসমাঈলের অন্তর্ভুক্ত।

উক্ত বাণীতে আরো বলা হয়েছে, 'তার জবান দিয়েই আমি আমার কথা বলব' প্রাচীন বাংলা অনুবাদে আছে 'তাহার মুখে আমার বাক্য দেব' এটি প্রাচীন ইংরেজি অনুবাদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অর্থাৎ হযরত মূসা ও ঈসাকে যেভাবে লিখিত আকারে আল্লাহর কালাম দেওয়া হয়েছিল উক্ত নবীকে সেভাবে দেওয়া হবে না। বরং আল্লাহর কালাম তাঁর মুখে তুলে দেওয়া হবে। আর এ কথা তো সবাই জানা যে, হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে লিখিত আকারে কোনো কিতাব দেওয়া হয়নি। বরং যে কুরআন শরীফ তাঁর ওপর অবতীর্ণ হয়েছিল তা তাঁর জবানেই ছিল।

ইঞ্জিল শরীফের প্রেরিত অংশে সর্বপ্রধান হাওয়ারী হযরত ঈসার শিষ্য পিতরের বক্তব্য দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, হযরত ঈসা (আ.)-এর শিষ্যদের বদ্ধমূল বিশ্বাস ছিল, এ ভবিষ্যদ্বাণীটি হযরত ঈসা (আ.) ছাড়া অন্য কোনো নবী সম্পর্কে করা হয়েছে। অতএব কোনো খ্রিস্টান যদি মনে করেন যে, মূসা (আ.)

ভবিষ্যদ্বাণীটি হযরত ঈসা (আ.)-এর ব্যাপারে তাহলে তা হবে সম্পূর্ণ ভুল। পিতরের বক্তব্যের বর্তমান বঙ্গানুবাদটি খানিকটা বিকৃত বিধায় আমরা ১৮৪১ সালের ফার্সি অনুবাদ থেকে তা তুলে ধরছি : পিতর বলেন, 'আপনারা তওবা করুন এবং আল্লাহর দিকে রুজু করুন, যাতে করে আপনাদের পাপ মোচন করা হয় এবং তিনি ঈসা মসীহকে যাকে তোমাদের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল পুনরায় পাঠাতে পারেন, কেননা আসমান তত দিন তাকে হেফাজত করবে, যত দিন পর্যন্ত প্রাচীনকাল থেকে পাক নবীদের মাধ্যমে আল্লাহ যা বলেছিলেন, তা না ঘটবে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, হযরত মূসা আমাদের পূর্বপুরুষদের বলেছিলেন, তোমাদের খোদা তোমাদের জন্য তোমাদের ভাইদের মধ্য থেকে আমার মতো একজন নবী পাঠাবেন। তিনি যা কিছু তোমাদেরকে বলবেন, তোমরা তা মান্য করবে, যে কেউ তাঁর কথায় কর্ণপাত করবে না, তাকে তাঁর লোকদের মধ্য থেকে একেবারে ধ্বংস করে ফেলা হবে।' (প্রেরিত : ১৮/১৯-২৩)

উপরিউক্ত বক্তব্য থেকে দিবালোকের ন্যায় এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ভবিষ্যদ্বাণীকৃত নবী হযরত ঈসা ব্যতীত অন্য কেউ হবেন। যার আগমনের পূর্ব পর্যন্ত হযরত ঈসা (আ.) আসমানে অবস্থান করবেন।

ইহুদী পণ্ডিতরা অকপটে স্বীকার করত যে, উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কেই করা হয়েছে। তাদের কেউ তো ইসলাম গ্রহণ করেছে যেমন, আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রাযি.)। আর কেউ কেউ সে সৎসাহস দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে।

হযরত আবূ হুরাইরা (রাযি.) বর্ণনা করেন, একবার নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইয়াহুদীদের বাইতুল মিদরাসে (যে ঘরে তারা তাওরাত ইত্যাদি পড়ে শোনাত) গেলেন এবং বললেন, তোমাদের সর্বাপেক্ষা বড় আলেমকে নিয়ে আসো। তারা আব্দুল্লাহ বিন সুরিয়াকে নিয়ে এল। তিনি তাঁকে নিরালায় নিয়ে স্রষ্টার কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি জানেন, আমি আল্লাহর রাসূল? উত্তরে বলল, হ্যাঁ, অবশ্যই জানি, আর আমাদের সকলেই আমার মতোই জানে। আপনার গুণাবলি তাওরাতে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু আমাদের লোকেরা প্রতিহিংসাবশত তা মানতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, আপনার ইসলাম গ্রহণ করতে বাঁধা কোথায়? সে বলল, আমি গোত্রীয় লোকদের বিরুদ্ধে চলা পছন্দ করি না। আমি আশাবাদী তারা আপনার কথা মেনে নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করবে আর তখন আমিও ইসলাম গ্রহণ করব।' (আল ওয়াফা : ১/১০৩, আশশিফা : ১/৩৬৩, সীরাতে ইবনে হিশাম : ২/৫১৮)

৪. হযরত ঈসা (আ.) আপন শিষ্যদেরকে মোনাজাতের বিষয়ে শিক্ষা দিতে গিয়ে বলেছিলেন, 'তোমরা এইভাবে মোনাজাত করো; হে আমাদের বেহেশতী পিতা! তোমার নাম পবিত্র বলে মান্য হোক, তোমার রাজ্য আসুক, তোমার ইচ্ছা যেমন বেহেশতে, তেমনি দুনিয়াতেও পূর্ণ হোক।' (মথি : ৬/৯-১০, লুক : ১১/২) অন্যত্র বলা হয়েছে, ঈসা (আ.) তাঁর বারজন শিষ্যকে ধর্ম প্রচারের দায়িত্ব দিয়ে পাঠানোর সময় বলেছিলেন, তোমরা যেতে যেতে এ কথার তাবলীগ করো

যে, বেহেশতী রাজ্য কাছে এসে গেছে। (মথি : ১০/৭) তাছাড়া হযরত ইয়াহইয়া (আ.) এবং হযরত ঈসা (আ.) এ একই কথার তাবলীগ করতেন যে, তাওবা করো। কারণ, বেহেশতী রাজ্য কাছে এসে গেছে। (মথি : ৩/১-২, ৪/১২-১৭) অন্যত্র উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত ঈসা (আ.) আরো সত্তরজন উম্মতকে তাবলীগে পাঠাবার জন্য বাছাই করলেন এবং যাবার সময় যা উপদেশ দিলেন তার মধ্যে 'আল্লাহর রাজ্য কাছে এসে গেছে' এর তাবলীগের উপদেশ ছিল। (লুক : ১০/১, ৮-১১)

উপরিউক্ত ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা বোঝা যায় যে, 'বেহেশতী রাজ্য' তথা ঈসা (আ.) কর্তৃক আনীত নাজাতের পথ ছাড়া অন্য কোনো একটা উত্তম নাজাতের পথ। আর তা হলো মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আনীত পথ। হযরত ঈসা (আ.) হযরত ইয়াহইয়া(আ.) এবং ঈসা (আ.)-এর শিষ্যদের যমানাতেও উক্ত নাজাতের পথ আসেনি। নতুবা তারা তা প্রকাশের সময় কাছে এসে গেছে মর্মে দাওয়াত প্রদান করতেন না এবং শিষ্যদেরকেও এ ব্যাপারে উপদেশ দিয়ে যেতেন না।

৫. হযরত ইদরীস (আ.) বলেন, (প্রাচীন ইংরেজি অনুবাদ হিসেবে বঙ্গানুবাদ) 'প্রভু তার দশ হাজার পবিত্র লোকের সঙ্গে এলেন।' (এহুদা : ১৪-১৫) এ পদটিতে খ্রিস্টানরা বিভিন্নভাবে পরিবর্তন সাধন করে তা অন্য খাতে প্রবাহিত করতে চেয়েছে। 'দশ হাজার'-এর অর্থ করেছে, অযুত অযুত। আরেক বাইবেলে অর্থ করেছে, লক্ষ। আর পবিত্র লোকের সঙ্গে আগমনের অর্থ করেছে, পবিত্রের নিকট থেকে এলেন, অর্থাৎ একাই বের হয়ে এলেন। এসব আলামাত দ্বারা যাতে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে চেনা না যায়, এ জন্য তারা এসব খিয়ানাতের আশ্রয় নিয়েছে। (বিস্তারিত দেখুন : খ্রিস্টান-মুসলিম সংলাপ পৃ. ৩৪) কিন্তু প্রাচীন ইংরেজি অনুবাদ দেখলে বোঝা যায়, উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে হযরত ইদরীস (আ.) 'প্রভু' বলে হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে আর 'পবিত্রলোক' বলে সাহাবায়ে কেরামকে বুঝিয়েছেন। কারণ তিনিই মক্কা বিজয়কালে দশ হাজার সাহাবীসহ মক্কায় হাজীর হয়েছিলেন।

৬. হযরত ঈসা (আ.) বলেন, 'তোমরা যদি আমাকে মুহাব্বাত করো, তাহলে আমার সমস্ত হুকুম মেনে চলবে, আমি পিতার নিকট প্রার্থনা করব এবং তিনি তোমাদের কাছে আরেকজন সাহায্যকারী প্রেরণ করবেন। তিনি তোমাদের কাছে চিরকাল থাকবেন। সেই সাহায্যকারীই সত্যের আত্মা। দুনিয়া তাকে গ্রহণ করতে পারে না, কারণ দুনিয়া তাকে দেখতে পায় না এবং তাকে জানেও না। তোমরা কিন্তু তাকে জানো, কারণ তিনি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন। তিনি তোমাদের অন্তরে বাস করবেন। (যোহন ১৪ : ২৫-২৬)

ঈসা মসীহ (আ.) আরো বলেন, তোমাদের সঙ্গে থাকতে থাকতেই এ সমস্ত কথা আমি তোমাদের বলছি। সেই সাহায্যকারী অর্থাৎ পাক রূহ যাঁকে পিতা আমার নামে পাঠিয়ে দেবেন, তিনিই সমস্ত বিষয় তোমাদের শিক্ষা দেবেন। আর আমি তোমাদের যা কিছু বলছি,

সেই সমস্ত তোমাদের মনে করিয়ে দেবেন। (যোহন : ১৫/২৬) এখানে সাহায্যকারীকে পাক রূহ বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, এটা খ্রিস্টান পণ্ডিতদের খিয়ানত। কারণ সাহায্যকারী পাক রূহ নন বরং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। কারণ তিনিই দুনিয়াবাসীকে হযরত ঈসা (আ.)-এর শিক্ষা মনে করিয়ে দিয়েছেন।

ঈসা (আ.) আরো বলেছেন, 'সাহায্যকারীকে আমি পিতার নিকট থেকে তোমাদের নিকট পাঠিয়ে দেব, তিনি যখন আসবেন, তখন তিনিই আমার বিষয় সাক্ষ্য দেবেন। তিনি সত্যের রূহ।' (যোহন : ১৬ :৭-৮) সত্যিই মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কিতাব আল-কোরআনে ঈসা (আ.) সম্পর্কে বিভিন্ন ভাবে সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে।

ঈসা (আ.) আরো বলেছেন, 'তবুও আমি তোমাদের সত্যি কথা বলছি যে, আমার যাওয়া তোমাদের জন্য ভালো, কারণ আমি না গেলে সে সাহায্যকারী তোমাদের নিকট আসবে না। আমি যদি চলে যাই তবে তাকে তোমাদের নিকট পাঠিয়ে দেব, আর তিনি এসে পাপের সম্বন্ধে, ধার্মিকতার সম্বন্ধে এবং বিচারের সম্বন্ধে জগৎকে দোষী সাব্যস্ত করবেন।' (যোহন : ১৬/১২)

ঈসা (আ.) আরো বলেন, 'পরন্ত সেই সত্যের আত্মা যখন আসবেন, তখন তিনি তোমাদের পথ দেখিয়ে পূর্ণ সত্যে নিয়ে যাবেন, কারণ তিনি নিজ থেকে কথা বলবেন না, কিন্তু যা কিছু শোনেন তাই বলবেন এবং আগামী ঘটনাও তিনি তোমাদের জানাবেন, তিনি আমাকে মহিমান্বিত করবেন। (যোহন : ১৬ : ১৩)

উপরোল্লিখিত বাণীগুলোতে হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আগমনের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। খ্রিস্টান পাদ্রিরা এসব বাণীর মধ্যে অনেক রদবদল করেছে। যাতে এসব বাণী দ্বারা হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বোঝা না যায়; বরং স্বয়ং (ঈসা.) কে বোঝা যায়। কিন্তু শেষ অবধি তারা সফল হতে পারেনি। কারণ এসব বাণীর মধ্যে এমন সব গুণাবলির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যা ঈসা (আ.)-এর মধ্যে পাওয়া যায় না। বরং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মধ্যেই পাওয়া যায়। কিভাবে এসব গুণাবলি হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মধ্যে পাওয়া যায় তা দেখানো হচ্ছে :

বলা হয়েছে, 'তিনি বিশ্বাসীদের কাছে

চিরকাল থাকবেন' অর্থাৎ তাঁর আদর্শ ও আনীত মুক্তির পথ কিয়ামত পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। এই গুণ হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথেই খাস।

বলা হয়েছে 'তিনি সমস্ত বিষয় মানুষকে শিক্ষা দেবেন' ইসলামই একমাত্র ধর্ম, যেখানে মানুষকে তার জীবনের প্রয়োজনীয় সমস্ত বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। আর এই পূর্ণ শিক্ষার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে বিদায় হজের সময় আরাফার দিন একটি আয়াত নাযিল করে।

বলা হয়েছে 'ঈসা মসীহ যা কিছু বলেছিলেন সেই সমস্ত কথা বিশ্বাসীদের মনে করিয়ে দেবেন' আল-কুরআন এ ব্যাপারে সাক্ষী যে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঈসা (আ.)-এর শিক্ষা বিশ্ববাসীকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

বলা হয়েছে, 'তিনিই ঈসা (আ.)-এর বিষয়ে সাক্ষ্য দেবেন, তাঁর সম্পর্কে বলবেন।' কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঈসা (আ.) সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছেন।

বলা হয়েছে, 'ঈসা (আ.) না গেলে সেই সাহায্যকারী বিশ্ববাসীর নিকট আসবেন না।' ঠিকই ঈসা (আ.) কে উঠিয়ে নেওয়ার পাঁচ শত বছর পর মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুনিয়াতে এসেছেন।

বলা হয়েছে, 'তিনি এসে পাপ, ধার্মিকতা ও বিচার সম্বন্ধে জগৎবাসীকে দোষী সাব্যস্ত করবেন।' এটাও মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) করেছেন। যেমন খ্রিস্টানরা তিন খোদা মানে, আল্লাহর সন্তান আছে বলে দাবি করে এবং আদম (আ.)-এর অন্যায় তাঁর সন্তানদের কাঁধে চাপিয়ে দেয়। অথচ এটা কোনো ন্যায়বিচার হতে পারে না যে, একজনের অন্যায় অন্যের কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া হবে।

আর খ্রিস্টানরা ধার্মিকতা বলতে মনে করে যে, শুধু এ কথা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করা যে, 'ঈসা মসীহ বিশ্বাবাসীর পাপ মোচনের জন্য ক্রুশ বিদ্ধ হয়ে মারা গেছেন।' তারা আরো বিশ্বাস করে যে, শরীয়াত মতো চললে মুক্তি নেই, শরীয়তমতো চলনেওয়ালা ঈসা মসীহ থেকে আরো দূরে সরে যায়। হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ উভয় বিষয়ে খ্রিস্টানদেরকে দোষী সাব্যস্ত করেছেন। ক্রুশের বিশ্বাসকে শিরক ও কোরআনবিরোধী বলেছেন এবং শুধুমাত্র শরীয়াহ মানার মধ্যে মুক্তির ঘোষণা করেছেন।

বলা হয়েছে, 'সেই সত্যের আত্মা মানুষকে পথ দেখিয়ে পূর্ণ সত্যে নিয়ে যাবেন।' আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওপর কোরআন নাযিল করে দ্বীনকে পূর্ণতায় পৌঁছে দিয়েছেন। যা বিদায় হজের সময় নাযিলকৃত আয়াতে বলা হয়েছে।

বলা হয়েছে, 'তিনি নিজ থেকে কথা বলবেন না, যা শোনেন তাই বলবেন।' আল-কোরআনের সূরা নাজমে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে বলা হয়েছে 'তিনি নিজের মনমতো কথা বলেন না; বরং তিনি যা বলেন সবই ওহী।'

বলা হয়েছে, 'তিনি আগামী ঘটনাও বিশ্ববাসীকে জানাবেন।' এর হাজারো প্রমাণ আছে যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনেক ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, যা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হয়েছে। যেমন কোরআন শরীফের সূরা রুম দেখুন।

বলা হয়েছে, 'তিনি ঈসা (আ.)-কে মহিমান্বিত করবেন।' মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল-কোরআনের মাধ্যমে ঈসা (আ.) সম্পর্কে অনেক বাস্তব আলোচনা করেছেন। যার দ্বারা ঈসা (আ.)-এর কদর বা মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রিয় পাঠক! ভেবে দেখুন, উপরোল্লিখিত গুণাবলি হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছাড়া আর কার মধ্যে বিদ্যমান ছিল? এসব ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, হযরত মুহাম্মাদই (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এসব কথার উদ্দেশ্য ছিলেন। সুতরাং খ্রিস্টান জগৎ যে এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলো পাক রূহের জন্য প্রমাণের চেষ্টা করে, তা একেবারেই ভুল। এসব আলামত পাক রূহের মধ্যে পাওয় যাওয়া তো দূরের কথা, আজ অবধি পাক রূহের কোনো অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যায়নি।

এখানে খ্রিস্টানদের ত্রিত্ববাদ সম্পর্কে কিছু কথা বলা সময়ের দাবি। তাই আল-কোরআন ও তাওরাত-ইঞ্জিল থেকে ত্রিত্ববাদ সম্পর্কে কিছু কথা সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হলো :

১. আল্লাহ তা'আলা ত্রিত্ববাদীদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বলছেন, 'হে গ্রন্থধারীগণ তোমরা নিজেদের ধর্মে সীমালংঘন করো না এবং আল্লাহ সম্বন্ধে ভ্রান্ত উক্তি করো না, আর তিন (খোদা) বলো না। ক্ষান্ত হও, এটি তোমাদের জন্য উত্তম হবে, প্রকৃত প্রভু তো এক আল্লাহই...।' (সূরা : ৪ আয়াত : ১৭১)

২. আল্লাহ তা'আলা ত্রিত্ববাদীদের ভয়ানক শাস্তির সংবাদ দিয়ে বলছেন : 'নিশ্চয়ই তারা কাফের যারা বলে, আল্লাহ তিনের এক, অথচ এক উপাস্য ছাড়া কোনো উপাস্য নাই। যদি তারা স্বীয় উক্তি থেকে নিবৃত্ত না হয়, তবে তাদের মধ্যে যারা কুফরে অটল থাকবে, তাদের ওপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পতিত হবে। তারা আল্লাহর কাছে তাওবা করে না কেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে না কেন? আল্লাহ যে ক্ষমাশীল, দয়ালু।' (সূরা : ৫ আয়াত : ৭৩-৭৪)

৩. আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 'দুই (বা ততধিক) উপাস্য গ্রহণ করো না, উপাস্য তো শুধু একজনই। সুতরাং তোমরা কেবল আমাকেই ভয় করতে

থাকো।' (সূরা : ১৬ আয়াত : ৫১)

তাওরাত-ইঞ্জিলেও একত্ববাদ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। ত্রিত্ববাদের প্রমাণ তাওরাত-ইঞ্জিলে নেই। যিশু একত্ববাদে বিশ্বাসী ছিলেন। আর এ কথা সর্বজনবিদিত যে, পুরাতন নিয়মে ত্রিত্ববাদের লেশ মাত্র নেই। মূসা (আ.)ও ত্রিত্ববাদ সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। আর ঈসা (আ.) তাঁর শিষ্যদেরকে একত্ববাদই শিক্ষা দিয়ে গেছেন। নিম্নে এ সম্পর্কে মূসা ও ঈসা (আ.)-এর উক্তি তুলে ধরা হলো।

মোশি মূসা (আ.) বলেন, 'হে ইস্রায়েল শোন! আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু একই সদাপ্রভু, আর তুমি তোমার সমস্ত হৃদয়, তোমার সমস্ত প্রাণ ও তোমার সমস্ত শক্তি দিয়া আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুকে প্রেম করিবে।' (দ্বিতীয় বিবরণ : ৬ : ৪-৫)

ফরিশীদের একজন আলেম ঈসা (আ.)কে জিজ্ঞাসা করলেন, হুজুর মূসার শরীয়তের মধ্যে সবচেয়ে বড় হুকুম কোনটা? যিশু কেবল মোশিরই পুনরুক্তি করে বললেন : প্রথমটি এই, হে ইস্রায়েল! শোন, আমাদের ঈশ্বর প্রভু একই প্রভু, আর তুমি তোমার সমস্ত হৃদয়, তোমার সমস্ত প্রাণ ও তোমার সমস্ত শক্তি দিয়া তোমার ঈশ্বর প্রভুকে প্রেম করিবে।' (বাইবেল, মার্ক : ১২ : ২৯-৩০)

ইঞ্জিল শরীফে বলা হয়েছে : 'খোদা এক এবং তিনি ছাড়া আর কোনা খোদা নাই।' (ইঞ্জিল শরীফ, মার্ক : ১২ : ৩২)

ত্রিত্ববাদের উৎস : মূলত ঈসা (আ.)-এর প্রস্থানের ৩২৫ বছর পর নেছীয়া সম্মেলনে এথ্যানেসিয়ান নামক একজন মিসরী যাজক ত্রিত্ববাদের জন্ম দেয়। সম্রাট কনস্ট্যানটাইন উক্ত মতবাদ মেনে নেয়। ওই সম্মেলনে আরো কতগুলো ধর্মমত গ্রন্থবদ্ধ করা হয়। তখন হতেই এ ধর্মমতকে এথ্যানেসিয়ান ধর্মমত বলা হয়ে থাকে। (সত্যের সন্ধানে পৃ. ২৭)

যাই হোক আল-কোরআন ও তাওরাত-ইঞ্জিলের আলোকে এ কথা প্রমাণিত হলো যে, ত্রিত্ববাদ বলতে কোনো কিছু নাই। বরং মোশি (মূসা) যিশু (ঈসা) এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সকলে একত্ববাদই শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন। তাই মুসলমান হয়ে যাওয়া এবং একত্ববাদে বিশ্বাসী হওয়াই ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের মুক্তির একমাত্র পথ। আমরা সমস্ত অমুসলিমদেরকে বিশেষ করে খ্রিস্টান ভাইদেরকে বাস্তবতা মেনে নিয়ে মুসলমান হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি। আল্লাহ তা'আলা সবাইকে সত্যকে বোঝার ও মানার তাওফীক দান করুন। আমীন।

হিন্দু ধর্মগ্রন্থে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)

হিন্দু ভাইয়েরা যেহেতু নিজের হাতের তৈরি মূর্তিকে নিজেই পূজা করে থাকেন, তাই মূল আলোচনার আগে জ্ঞানীদের জন্য মূর্তি পূজা সম্পর্কে অন্তরচক্ষু খুলে দেওয়ার মতো আল- কোরআনের একটি উপমা তুলে ধরছি :

আল-কোরআনে আল্লাহ তা'আলা মূর্তি পূজারিদেরকে মূর্তি পূজা থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য খুব সুন্দর একটি উপমা দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন : 'হে মানবমণ্ডলী! একটি উপমা দেওয়া হচ্ছে, মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ করো; তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাকো (মূর্তি) তারা তো কখনো একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না, এই উদ্দেশ্যে তারা সবাই একত্রিত হলেও পারবে না; এবং মাছি যদি (তাদের সামনে রাখা প্রসাদ থেকে) কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায়, এটাও তারা মাছির নিকট থেকে উদ্ধার করতে পারবে না। পূজারি ও দেবতা কতই দুর্বল!' (সূরা হজ, আয়াত : ৭৩)

আজ বিজ্ঞানের উন্নতির যুগে ভাবতেই অবাক লাগে যে, সুস্থ জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ কিভাবে নিজের হাতের তৈরি মূর্তিকে নিজেই পূজা করে! পূজা যদি করতেই হয়, তাহলে মূর্তির জন্য উচিত ছিল তার তৈরিকারীর পূজা করা। কিন্তু সে পূজা করবে কী, সেত তার খাদ্যের ওপর থেকে একটা মাছিও তাড়াতে পারে না। সে এতই দুর্বল যে, নিজে দাঁড়াতেও পারে না, বাঁশের খুঁটির জোরে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। এই যখন মূর্তির অবস্থা, তখন কোন যুক্তিতে মূর্তির চেয়ে কোটি গুণ শক্তিশালী মানুষ মূর্তিকে পূজা করতে পারে?

যাই হোক, মূল আলোচনায় আসা যাক। আজ থেকে প্রায় বিশ-বাইশ বছর আগে ভারতে হিন্দি ভাষায় হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে গবেষণালব্ধ একটি বই প্রকাশিত হয়েছে। বইটি সমগ্র ভারতে দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। বইটির নাম "কল্কী অবতার" (যার অর্থ শেষ নবী)। বইটির লেখক একজন স্বনামধন্য হিন্দু পণ্ডিত, পণ্ডিত বেদ প্রকাশ উপাধ্যায়। তাঁর জন্ম এক সম্ভ্রান্ত হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিবারে। তিনি নিজেও হিন্দু। কিন্তু সত্য প্রকাশ করতে কার্পণ্য করেননি। এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটির সংস্কৃত বিভাগের রিসার্চ স্কলার, প্রখ্যাত গবেষক এবং স্বনামধন্য পণ্ডিত। 'কল্কী অবতার' শীর্ষক গ্রন্থে খ্যাতনামা আরও আটজন হিন্দু পণ্ডিতের সমর্থন রয়েছে। তাদের সত্যায়িত স্বাক্ষরও উক্ত গ্রন্থে রয়েছে।

পণ্ডিত বেদ প্রকাশ উপাধ্যায় বলেন, হিন্দু ধর্মের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থসমূহে যে পথপ্রদর্শক মহাপুরুষ (বিশ্বনবী)-এর আগমনবার্তা "কল্কী অবতার" নামে লিপিবদ্ধ রয়েছে, তিনি মূলত আরবের মুহাম্মাদ সাহেবই। সেই প্রতিশ্রুত 'কল্কী অবতার' তিনি ব্যতীত আর অন্য কেউ নন। সুতরাং সারা বিশ্বের হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের উচিত, আর অপেক্ষা না করে, মহাপুরুষ মুহাম্মাদ সাহেবকে "কল্কী অবতার" (বিশ্বনবী) হিসেবে মেনে নেয়া। (যার দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে- তাঁর ওপর ঈমান আনা এবং তাঁর আনীত ইসলাম ধর্মকে গ্রহণ করা।)

বইয়ের লেখক বেদ প্রকাশ উপাধ্যায়

সুস্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন, হিন্দু ধর্মের অনুসারীগণ "কল্কী অবতার"-এর অপেক্ষা করছেন, কিন্তু এটা এমন একটি অপেক্ষা, কিয়ামত পর্যন্ত যার যবনিকাপাত ঘটবার নয়। কারণ, তারা যে পবিত্র সত্তার, যে মহাপুরুষের আগমনের অপেক্ষায় রয়েছেন, তাঁর তো আত্মপ্রকাশ ঘটে গেছে আজ হতে প্রায় চৌদ্দ শত বৎসর পূর্বেই। তিনি এসে তাঁর মিশন বাস্তবায়িত করে লোক চক্ষুর অন্তরালে চলে গেছেন।

পণ্ডিত বেদ প্রকাশ উপাধ্যায় তাঁর দাবির স্বপক্ষে হিন্দু ধর্মের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ 'বেদ' ও 'পুরাণ' হতে দলিল পেশ করেছেন। তিনি লিখেছেন-

(ক) "পুরাণ" (হিন্দু ধর্মের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ) এ লেখা আছে, "কল্কী অবতার" এ জগতে ভগবানের (আল্লাহ্‌র) সর্বশেষ বার্তাবাহক (পয়গাম্বর) হবেন। তিনি সমগ্র জগৎ এবং বিশ্ব মানবতার পথপ্রদর্শক হিসেবে প্রেরিত হবেন।' এ বর্ণনার পর পণ্ডিতজি লিখেছেন, এটা একমাত্র মুহাম্মাদ সাহেবের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হচ্ছে। তিনিই সমগ্র জগৎ ও বিশ্ব মানবতার পথপ্রদর্শক।

(খ) হিন্দু ধর্মমতের একটি ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী "কল্কী অবতার" (বিশ্বনবী) একটি দ্বীপসদৃশ স্থানে জন্মগ্রহণ করবেন। হিন্দু ধর্মের কথিকা অনুযায়ী এ দ্বীপটি আরব দেশই, যা আরব উপদ্বীপ নামে খ্যাত।

(গ) হিন্দু ধর্মের পবিত্র গ্রন্থে উল্লেখ আছে, "কল্কী অবতারের" পিতার নাম "বিষ্ণু ভগত" এবং মাতার নাম হবে "সুমানিব"। সংস্কৃতে "বিষ্ণু"-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- "আল্লাহ" এবং "ভগত"-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- "বান্দা"। সুতরাং "বিষ্ণু ভগতের" আরবী রূপ হবে "আবদুল্লাহ্‌" যার অর্থ হচেছ- "আল্লাহর বান্দা"। "সুমানিব"-এর অভিধানিক অর্থ হচ্ছে- আমন বা শান্তি, যার আরবী রূপ হচ্ছে "আমিনা"। হযরত মুহাম্মাদ সাহেবের পিতার নাম আবদুল্লাহ্‌ এবং মাতার নাম আমিনাই ছিল।

(ঘ) হিন্দু ধর্মের ধর্মীয় গ্রন্থসমূহে উল্লেখ আছে, "কল্কী অবতার"-এর প্রধান খাদ্য হবে খেজুর ও জয়তুনের তেল এবং তিনি সেখানকার লোকজনদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা আমানতদার ও সত্যবাদী হবেন। বলা বাহুল্য, এটাও মুহাম্মাদ সাহেবের ওপর পরিপূর্ণরূপে প্রযোজ্য।

(ঙ) বেদ গ্রন্থসমূহে লেখা আছে, 'কল্কী অবতার, তাঁর এলাকার সর্বাপেক্ষা সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করবেন।' এটাও পরিপূর্ণভাবে মুহাম্মাদ সাহেবের ওপর প্রযোজ্য হয়।

(চ) 'কল্কী অবতারকে, ভগবান (আল্লাহ্‌) নিজস্ব বার্তাবাহক (ফেরেশতা)-এর মাধ্যমে গুহার ভেতর শিক্ষা প্রদান করবেন।' এটাও মুহাম্মাদ সাহেবের সাথেই খাটে। কারণ হযরত মুহাম্মাদ সাহেবকে জিব্রাঈল ফেরেশতার মাধ্যমে হেরা গুহায় শিক্ষা দান করা হয়েছে।

(ছ) ভগবান (আল্লাহ্‌)-এর পক্ষ হতে 'কল্কী অবতারকে একটি দ্রুতগামী ঘোড়া প্রদান করা হবে, যার ওপর সওয়ার হয়েই সমগ্র জগৎ এবং সপ্তম আকাশ পরিভ্রমণ করবেন।' হযরত মুহাম্মাদ সাহেবের "বোরাকে" বসে মি'রাজ গমনের দিকে উপরের বক্তব্যে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে।

(জ) 'কল্কী অবতারকে ভগবান (আল্লাহ) আসমানী সাহায্য দানে ধন্য করবেন।' বদর ও উহুদের যুদ্ধে মুহাম্মাদ সাহেবকে ফেরেশতার দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে, যা ছিল আসমানী সাহায্য।

(ঝ) 'কল্কী অবতার ঘোড় সওয়ার ও তলোয়ার চালনায় হবেন সুদক্ষ।' এ দলিলটি উল্লেখ করার পর পণ্ডিতজি যা লিখেছেন, তা প্রণিধানযোগ্য। তিনি লেখেন বাস্তব সত্য হচ্ছে, ঐশীগ্রন্থ কোরআনে বর্ণিত, মুহাম্মাদ সাহেবই সেই "কল্কী অবতার" (বিশ্বনবী) যার আলোচনা আমাদের (হিন্দু) ধর্ম গ্রন্থসমূহে বিদ্যমান রয়েছে।

উপর্যুক্ত দলিল ছাড়া আরো বহুসংখ্যক দলিল দ্বারা তিনি প্রমাণ করার প্রয়াস পেয়েছেন যে, হিন্দু ধর্মের ধর্ম গ্রন্থসমূহে "কল্কী অবতার" (মহাপুরুষ) হিসেবে যার আগমনের কথা উল্লেখ রয়েছে, তিনি আরবের "মুহাম্মাদ সাহেব" ব্যতীত অন্য আর কেউ নন। সুতরাং যারা আমাদের পবিত্র গ্রন্থসমূহের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী "কল্কী অবতার"-এর অপেক্ষা করছেন, তাঁদের চিন্তাধারা পরিবর্তন করা উচিত।

("সাপ্তাহিক আল-জমিয়ত" দিল্লি, ষষ্ঠ বর্ষ, ৩৫তম সংখ্যা ২৭ শে আগস্ট, ১৯৯৩ ইং এর সৌজন্যে।)

সারকথা, পণ্ডিত বেদ প্রকাশ সাহেবের কথা দ্বারা এ কথা স্পষ্ট বোঝা গেল যে, হিন্দু ভাইয়েরা যদি আসলেই হিন্দু হয়ে থাকে এবং তাদের ধর্মীয় গ্রন্থ মেনে থাকে, তাহলে তাদের জন্য জরুরি হলো মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আনীত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে যাওয়া। হিন্দু ভাইদের এ কথা জেনে রাখা উচিত যে, আল-কোরআনে সব মানুষের স্রষ্টা মহান আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন, 'যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্ম পালন করে, তা কখনো তার থেকে গ্রহণ করা হবে না এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।' (সূরা আল ইমরান, আয়াত : ৮৫)

তাই জ্ঞানী হিন্দু ভাইবোনদের কাছে আমাদের আবেদন, আপনারা যদি পরকালের অশেষ-অসীম জীবনে শান্তি চান, যদি নরক থেকে বাঁচতে চান এবং স্বর্গে যেতে চান, তাহলে আপনাদের ধর্মগ্রন্থে যে 'কল্কী অবতার'-এর কথা বলা হয়েছে (যিনি মূলত ইসলামের নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে মানুন এবং তাঁর আনীত ধর্ম 'ইসলাম' গ্রহণ করে ইহকাল ও পরকালের সর্বোচ্চ সফলতা অর্জন করুন। আল্লহ তা'আলা আমাদের সবাইকে হেদায়াতের পথে পরিচালিত করুন। আমীন।

ইসলামী অর্থনীতি

মুদ্রার তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ও শরয়ী বিধান-১২

মাওলানা আনোয়ার হোসাইন

মুদ্রা এবং পয়সার বিনিময় :

বাঈ ছরফ এবং পয়সা, পূর্বে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে যে, হানাফী, শাফেয়ী, হাম্বলী, মাযহাবত্রয়ে বাঈ ছরফ হওয়ার জন্য বিনিময়দ্বয় প্রকৃতিগত ছমন হওয়া জরুরি।

এ বিষয়ের জরুরি কিছু আলোচনা নিম্নে পেশ করা হলো–

আল্লামা হাছকফী (রহ.) বলেন,

وشرعا بيع الثمن بالثمن اى ما خلق للثمنية ومنه المصوغ جنسا بجنس او بغير جنس ـ

অর্থাৎ ইসলামী শরীয়তে বাঈ ছরফ বলা হয় প্রকৃতিগত ছমনকে ছমনের বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয়কে। প্রকৃতিগত ছমন বলতে বোঝানো হয় স্বর্ণ ও রৌপ্যকে। তাই তদ্বারা বানানো পাত্রের বিনিময়কেও বাঈ ছরফ বলা হবে। চাই সমজাতীয়কে-সমজাতীয়ের বিনিময়ে হোক বা ভিন্ন জাতীয়ের বিনিময়ে হোক। (শামী ৭/৪০২)

আল্লামা মিরগীনানী (রহ.) বলেন,

سواء كان يتعينان كالمصوغ او لا يتعينان كالمضروب او يتعين احدهما ولا يتعين الآخر لاطلاق مارويا ولانه ان كان يتعين ففيه شبهة التعيين لكونه ثمنا خلقة فيشترط قبضة اعتبارا للشبهة فى الربا ـ

অর্থাৎ বিনিময়দ্বয় নির্ধারণ করা দ্বারা নির্ধারিত হোক যথা বিনিময়দ্বয় পাত্র, অথবা নির্ধারিত না হোক যথা বিনিময়দ্বয় মুদ্রা। অথবা বিনিময়দ্বয়ের মধ্যে একটা নির্ধারণ করা দ্বারা নির্ধারিত হোক অপরটা না হোক। উল্লিখিত সব পদ্ধতি বাঈ ছরফের অন্তর্ভুক্ত। যেহেতু এ-সংক্রান্ত হাদীস মুতলাক তথা-ব্যাপক। অপরদিকে, প্রকৃতিগত ছমন হওয়ায় এর মধ্যে নির্ধারণ দ্বারা নির্ধারিত করণ সত্ত্বেও এক প্রকারের অনির্ধারিত হওয়ার অবকাশও রয়ে যায়। তাই সুদের সন্দেহ থাকার কারণে এতে বিনিময়দ্বয়ের ওপর তাৎক্ষণিক কবজ জরুরি। (আল হিদায়া মা'আল ফতহ ৬/২৬১)

যার মর্মার্থ হলো, যদি বিনিময়দ্বয়ের মধ্যে একদিকে স্বর্ণ অথবা রৌপ্যের পাত্র হয় অথবা অলংকার হয়। অপরদিকেও স্বর্ণ অথবা রৌপ্যের পাত্র অথবা অলংকার হয়। অথবা বিনিময়দ্বয়ের উভয় দিকে দিরহাম বা দিনার হয়। অথবা একদিকে দিরহাম বা দিনার, এবং অপরদিকে স্বর্ণ অথবা রৌপ্যের পাত্র বা অলংকার হয়। উল্লিখিত সব পদ্ধতি বাঈ ছরফ। কেননা এগুলো সবটি প্রকৃতিগত ছমন। তাই উপর্যুক্ত সব পদ্ধতিতে তাৎক্ষণিক কবজ করা জরুরি।

আল্লামা নাসাফী (রহ.) বলেন,

وغالب الغش ليس فى حكم الدراهم والدنانير فيصح بيعها بجنسها متفاضلا والتبايع والاستقراض بما يروج عددا او وزنا اوبهما ولا يتعين بالتعيين لكونها اثمانا

অর্থাৎ স্বর্ণ-রৌপ্যে খাদ বা অন্যান্য ধাতুর পরিমাণ যদি বেশি হয়, তাহলে তা দিরহাম-দিনারের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে না। সুতরাং ওই ধরনের স্বর্ণ-রৌপ্যকে তার সমজাতীয়ের বিনিময়ে অতিরিক্তসহ বিক্রি জায়েয হবে এবং প্রথাগতভাবে ওই সব স্বর্ণ-রৌপ্যের ক্রয়-বিক্রয় ওজন ও সংখ্যায় বৈধ হবে। তবে এগুলোও নির্ধারণ করা দ্বারা নির্ধারিত হবে না। কেননা এগুলোও ছমন। (কানজ মা'আল বাহার ৬/৩৩৫)

উক্ত বক্তব্যের ওপর আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.) বলেন-

قوله ولا يتعين بالتعيين لكونها اثمانا يعنى مادامت تروج لانها بالاصطلاح صارت اثمانا فما دام ذلك الاصطلاح موجادا لا تبطل الثمنية لقيام المقتضى ـ

অর্থাৎ আল হিদায়া প্রণেতার বক্তব্য "তা নির্ধারণ করা দ্বারা নির্ধারিত হয় না। যেহেতু ওইগুলো ছমন।" অর্থাৎ যত দিন এর প্রচলন থাকবে। কেননা এগুলো ব্যবসায়ীদের পরিভাষার মাধ্যমে ছমনের স্বীকৃতি পেয়েছে। তাই যত দিন উক্ত পরিভাষার প্রচলন থাকবে, তত দিন তা ছমনও থাকবে, তার ছমন হওয়ার কার্যকারিতাও থাকবে। যেহেতু বাজারে এর চাহিদা বিদ্যমান।

উক্ত বক্তব্যের সারসংক্ষেপ হলো, যদি স্বর্ণ-রৌপ্যের মধ্যে খাদ বা অন্যান্য ধাতুর পরিমাণ বেশি হয়, স্বর্ণ-রৌপ্যের পরিমাণ কম হয় এবং এর প্রচলন ও থাকে। তাহলে ওইগুলো ক্রয়-বিক্রয় কমবেশ করেও বৈধ হবে। বিনিময়দ্বয় সমজাতীয় হলেও। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওইগুলো নির্ধারণ করা দ্বারা নির্ধারিত হয় না। কেননা এগুলোও ছমন। তবে প্রথাগত ছমন, প্রকৃতিগত নয়।

উপর্যুক্ত বক্তব্য দ্বারা এ কথা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, এতেও ছমনের বিনিময়ে ছমন হয়। কিন্তু প্রকৃতিগত ছমন নয় বিধায় উক্ত পদ্ধতিকে বাঈ ছরফের অন্তর্ভুক্ত না করে সমজাতীয়ের বিনিময়ে সমজাতীয়ের ক্রয়-বিক্রয় সত্ত্বেও এতে

عرف الحنفية الصرف بانه بيع الاثمان بعضها ببعض وارادوا من الاثمان ماكان ثمنا خلقة اى من القدم وهو الذهب والفضة سواء كانا مسكوكين دنانير ودراهم وهى المعروفة بالنقدين او كانا مصوغين كالاقراط والاساور او كانا تبرا وعبر الشافعية والحنابلة عن الثمن بالنقد فقالوا الصرف بيع النقد بالنقدين جنسه او غيره ارادوا بالنقد كذلك الذهب والفضة مسكوكين او مصوغين او تبرا والحكم فى المذاهب الثلاثة هو ان الذهب والفضة اذا بيعا بجنسها كذهب بذهب او فضة بفضة وجب الحلول والتماثل والتقابض الى قوله والتعريف السابق للصرف عند الائمة الثلاثة يفيد انه محصور فى الذهب والفضة الذين لا يغلب عليهما الغش فاذا كانت الدراهم مغشوشة ورائجة اوكان النقدمن الجانبين فلوسا رائجة لايجرى فيهما حكم الصرف۔

অর্থাৎ হানাফী মাযহাবের ইমামগণ বাঈ ছরফের সংজ্ঞা এভাবে করেছেন যে, ছমনকে ছমনের বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় করা। তাদের নিকট এ ক্ষেত্রে ছমন দ্বারা উদ্দেশ্য হলো প্রকৃতিগত ছমন, যা আদিকাল থেকে ছমন রূপে সাব্যস্ত। আর তা হলো স্বণ-রৌপ্য। এর আকৃতি মুদ্রা তথা দিরহাম-দিনারের হোক, যা নকদাইন হিসেবে প্রসিদ্ধ অথবা অলংকার রূপে, যথা কানের দুল, হাতের চুড়ি অথবা স্বর্ণ রেণুর আকৃতিতে হোক।

শাফেয়ী, হাম্বলী মাযহাবের ইমামগণ ছমনকে নকদ দ্বারা সংজ্ঞায়িত করেছেন তাদের মতে বাঈ ছরফ বলা হয়, নকদকে নকদের বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয়কে। বিনিময়দ্বয় সমজাতীয় হোক বা না হোক। তাদের নিকটও নকদ দ্বারা স্বর্ণ-রৌপ্যই উদ্দেশ্য। তা যে আকৃতিতেই হোক না কেন? এবং উল্লিখিত মাযহাবত্রয়ে এর হুকুমও এক

আল্লামা ইবনে তাইমিয়্যা (রহ.) বলেন,

والثانية لايشترط الحلول والتقابض فان ذلك معتبر فى جنس الذهب والفضة سواء كان ثمنا او كان صرفا اوكان مكسورا بخلاف الفلوس ولان الفلوس هى فى الاصل من باب الاعراض والثمنية عارضة لها۔

অর্থাৎ দ্বিতীয় রেওয়ায়াত হলো এই যে, নগদ প্রদান (Cash payment) এবং বিনিময়দ্বয়ের ওপর তাৎক্ষণিক কবজ জরুরি নয়। কেননা এটি স্বর্ণ-রৌপ্যজাতীয় বস্তুতে প্রযোজ্য। তা যে প্রকারেরই হোক না কেন। পক্ষান্তরে পয়সা। এটি স্বর্ণ-রৌপ্যের সমজাতীয়ের অন্তর্ভুক্ত নয় বরং বাস্তবে তা পণ্যের অন্তর্ভুক্ত। এতে ছমনিয়্যাত তথা ছমন হওয়ার যোগ্যতা অস্থায়ীভাবে যুক্ত হয়েছে। (মজমুয়া ফাতাওয়া ২৯/৪৫৯)

উল্লিখিত বক্তব্য ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর দ্বিতীয় রেওয়ায়াত যার সারমর্ম হলো, বাঈ ছরফের জন্য প্রকৃতিগত ছমন হওয়া জরুরি।

আল্লামা যুহাইলী বলেন,

وشرعا هو بيع النقد بالنقد جنسا بجنس او بغير جنس اى بيع الذهب بالذهب او الفضة بالفضة او الذهب بالفضة مصوغا او نقدا۔

অর্থাৎ ইসলামী শরীয়তে বাঈ ছরফ নকদকে নকদের বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয়কেই বলা হয়। চাই সমজাতীয়কে সমজাতীয়ের বিনিময়ে হোক বা ভিন্ন জাতীয়ের বিনিময়ে। অর্থাৎ স্বর্ণকে স্বর্ণের বিনিময়ে বা রৌপ্যকে রৌপ্যের বিনিময়ে অথবা স্বর্ণকে রৌপ্যের বিনিময়ে হোক। চাই তা মুদ্রার আকৃতিতে হোক বা পাত্র রূপে। (আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ৪/৬৩৬)

তাতাউরুন্নুকূদ কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে,

অতিরিক্ততাকে বৈধ বলা হয়েছে।

হানাফী মাযহাবের উদ্ধৃত ফকীহদের উপর্যুক্ত মতামত প্রমান করে বাঈ ছরফ হওয়ার জন্য শুধু ছমন হওয়া যথেষ্ট নয় বরং প্রকৃতিগত ছমন হতে হবে। তা যে রূপেই হোক না কেন। তবে কোনো বস্তুকে নির্ধারণ করা দ্বারা নির্ধারিত না হওয়ার জন্য শুধু ছমন হওয়াটাই যথেষ্ট। চাই প্রকৃতিগত ছমন হোক বা প্রথাগত।

হাম্বলী মাযহাবের প্রসিদ্ধ কিতাব কাশশাফুল কনা'তে উল্লেখ আছে যে,

فصل فى المصارفة وهى بيع نقد بنقد اتحد الجنس او اختلف

অর্থাৎ, মুছারাফা বলা হয়, মুদ্রাকে মুদ্রার বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয়কে তা সমজাতীয় হোক বা ভিন্নজাতীয়। তাঁরা যেহেতু এর ব্যাখ্যায় দ্বিবচনমূলক শব্দ 'নকদাইন' ব্যবহার করে থাকে তদ্রূপ দিরহাম-দিনার, স্বর্ণ-রৌপ্য এভাবে উল্লেখ করে থাকেন। তাই এর দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, তাদের নিকট বাঈ ছরফের মধ্যে 'নকদ' শব্দ দ্বারা প্রকৃতিগত ছমনই উদ্দেশ্য। (কাশশাফুল কনা' ৩/২৫৩)

শাফেয়ী মাযহাবের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ মুগনীল মুহতাজে উল্লেখ রয়েছে যে,

النقد بالنقد والمراد به الذهب والفضة مضروبا كان او غير مضروب

অর্থাৎ বাঈ ছরফ নকদের বিনিময়ে নকদের ক্রয়-বিক্রয়কে বলা হয়। এখানে নকদ শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো স্বর্ণ-রৌপ্য তা যে আকৃতিতেই হোক না কেন। (২/২৪)

উক্ত কিতাবে আরো উল্লেখ রয়েছে যে,

"تنبيه" بيع النقد بالنقد من جنسه وغيره يسمى صرفا

অর্থাৎ, নকদের বিনিময়ে নকদের ক্রয়-বিক্রয়কে বাঈ ছরফ বলা হয়। বিনিময়দ্বয় সমজাতীয় হোক বা ভিন্ন জাতীয়। (প্রাগুক্ত)

ও অভিন্ন। তা হলো, স্বর্ণ এবং রৌপ্যের ক্রয়-বিক্রয় যখন সমজাতীয়ের মধ্যে হবে, যথা স্বর্ণকে স্বর্ণের অথবা রৌপ্যকে রৌপ্যের বিনিময়ে হবে, তখন বিনিময়দ্বয় নগদ আদান-প্রদান, সমতা এবং তাৎক্ষণিক কবজ জরুরি হবে।

ইমামত্রয়ের পেশকৃত বাঈ ছরফের সংজ্ঞা দ্বারা বোঝা যায় যে, বাঈ ছরফ শুধুমাত্র ওই সব স্বর্ণ এবং রৌপ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ, যাতে খাদ বা অন্যান্য ধাতুর পরিমাণ বেশি হবে না। সুতরাং যদি স্বর্ণ বা রৌপ্যে খাদ বা অন্যান্য ধাতুর পরিমাণ স্বর্ণ বা রৌপ্যের তুলনায় বেশি হয়। অথবা বিনিময়দ্বয় প্রচলিত পয়সা হয়। তাহলে ওই ধরনের আকদকে আকদে ছরফ বলা হবে না।

উপরিউক্ত বক্তব্যসমূহের সারমর্ম হলো এই যে, ইমামত্রয়ের নিকট আকদে ছরফ হওয়ার জন্য প্রকৃতিগত ছমন হতে হবে এবং খাদ বা অন্যান্য ধাতু মিশ্রিত হলে এর ওপর স্বর্ণ-রৌপ্যের পরিমাণ অবশ্যই বেশি হতে হবে। তাই পয়সার ক্রয়-বিক্রয় বাঈ ছরফের অন্তর্ভুক্ত হবে না। বরং স্বর্ণ অথবা রৌপ্যের মধ্যে যদি অন্যান্য ধাতু বা খাদ মিশ্রিত থাকে এর পরিমাণ স্বর্ণ-রৌপ্যের পরিমাণ থেকে বেশি হয় এবং মুদ্রা হিসাবে উক্ত স্বর্ণ-রৌপ্যের প্রচলনও হয় তা সত্ত্বেও ওইগুলোর ক্রয়-বিক্রয় বাঈ ছরফ নয়, যা কানজুদ্দাকায়েকের ইবারত দ্বারা পরিষ্কার।

وغالب الغش ليس فى حكم الدراهم والدنانير فيصح بيعها بجنسها متفاضلا والتبايع والاستقراض بما يروج عددا او وزنا اوبهما ولا يتعين بالتعيين لكونها اثمانا.

অর্থাৎ স্বর্ণ বা রৌপ্যের মধ্যে যদি খাদ বা অন্যান্য ধাতুর পরিমাণ বেশি হয় তাহলে তা দিরহাম ও দিনারের বিধানের মধ্যে পড়ে না। তাই ওইগুলোর ক্রয়-বিক্রয় সমজাতীয়ের মধ্যেও অতিরিক্ত সহকারে জায়েয এবং প্রথা ও প্রচলন মতে ওইগুলো প্রকৃতিগত ছমনের মতো নির্ধারণ করা দ্বারা নির্ধারিত হয় না। (কানয মা'আল বাহর, ৬/৩৩৫)

উল্লেখ্য, সুদ এবং বাঈ ছরফ উভয়টা ভিন্ন ভিন্ন বিষয়। তবে এমনও হতে পারে যে, কোনো পদ্ধতিতে সুদ হয়, বাঈ ছরফ হয় না। যেমন গমকে গমের বিনিময়ে যদি অতিরিক্ত সহকারে বিক্রি করা হয়। তাহলে তা হবে সুদ এবং অবৈধ। কিন্তু উক্ত পদ্ধতি বাঈ ছরফ নয়। তদ্রূপ যদি এক পয়সাকে দুই পয়সার বিনিময়ে বিক্রি করা হয় এবং অনির্ধারিত হয় তাহলে হানাফী, মালেকী মাযহাব মতে তা হবে সুদ এবং হারাম। কিন্তু হানাফী মাযহাব মতে তা বাঈ ছরফ নয়। বাঈ ছরফ না হওয়ার কারণে সমজাতীয়কে ভিন্ন জাতীয়ের বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় করা হলে অতিরিক্ততা বৈধ হবে। খিয়ারে শর্ত তথা Optional Condition কে উক্ত আকদ গ্রহণ করবে এবং Defferd payment তথা বাকিতে হতে পারবে। এবং বিনিময়দ্বয়ের ওপর তাৎক্ষণিক কবজও জরুরি হবে না। বরং একপক্ষীয় কবজ যথেষ্ট হবে। যাতে বাইউল কালী বিল কালী তথা ঋণের বিনিময়ে ঋণের বিক্রয় না হয়।

ফতহুল কাদীর গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে,

ان يبيع فلسا بغير عينه بفلسين بغير اعيانهما لا يجوز لان الفلوس الرائجة امثال متساوية قطعا لاصطلاح الناس على سقوط قيمة الجودة منها فيكون احدهما فضلا خاليا مشروطا فى العقد وهو الربا.

অর্থাৎ অনির্ধারিত এক পয়সাকে যদি অনির্ধারিত দুই পয়সার বিনিময়ে বিক্রয় করা হয় তাহলে তা অবৈধ হবে। কেননা প্রচলিত পয়সা হলো সমমানের। যেহেতু ব্যবসায়ীরা তার শ্রেষ্ঠত্বের মূল্যকে রহিত করে দিয়েছে। তাই উক্ত পদ্ধতিতে একটা পয়সা তো অপরটার বিনিময় হলো বাকি একটা বিনিময়বিহীন হয়ে যাবে। আর তা-ই হলো সুদ।

উপর্যুক্ত বক্তব্য দ্বারা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, যদি অনির্ধারিত এক পয়সাকে অনির্ধারিত দুই পয়সার বিনিময়ে বিক্রয় করা হয় তা হবে সর্বসম্মত হারাম। কেননা পয়সা যেহেতু একটা অপরটার সমমানের, সেহেতু একটা পয়সা অপর একটার বিনিময় হলেও অন্য একটা বিনিময়বিহীন থাকায় সুদ হয়ে যাবে, যা ইসলামী শরীয়তে হারাম। তবে পয়সাকে লেনদেনের সময় যদি নির্ধারণ করা হয় যথা বিক্রেতা যদি বলে আমার এই পয়সাটা তোমার ওই দুই পয়সার বিনিময়ে বিক্রয় করছি তাহলে উক্ত পদ্ধতি ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর মতে বৈধ হবে। কেননা নির্ধারণ করার দ্বারা ওই পয়সাগুলো সাধারণ পণ্যের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে এবং পণ্যের মধ্যে এক বিনিময়ের ওপর অপর বিনিময়ের অতিরিক্ততা বৈধ। প্রকারান্তরে এটাই হলো যে, পয়সা ব্যবসায়ীদের পরিভাষা দ্বারা ছমন হয়েছিল এবং ক্রেতা-বিক্রেতার পরিভাষা দ্বারা তার ছমন হওয়ার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতে উক্ত পদ্ধতিও অবৈধ। কেননা তিনি বলেন, পয়সা যখন ব্যবসায়ীদের পরিভাষা দ্বারা ছমন হয়েই গেছে, এখন ক্রেতা-বিক্রেতার এ অধিকার নেই যে, তারা চাইলেই এর ছমনিয়্যত তথা ছমন হওয়ার যোগ্যতা বাতিল করে দিতে পারবে। হ্যাঁ, সবাই যদি ঐকমত্যের ভিত্তিতে তার ছমনিয়্যত বাতিল করে দেয়, তবে ভিন্ন কথা।

সুদ বিষয়ে আল্লামা কাসানী (রহ.)

লেখেন-

ويجوز بيع المعدودات المتقاربة من غير المطعومات بجنسها متفاضلا عند ابى حنيفة وابى يوسفؒ بعد ان يكون يدا بيد كبيع الفلس بالفلسين باعيانهما وعند محمد لا يجوز وجه قوله ان الفلوس اثمان فلا يجوز بيعها متفاضلا كالدراهم والدنانير ودلالة الوصف عبارة عما تقدر به مالية الاعيان ومالية الاعيان كما تقدر بالدراهم والدنانير تقدير بالفلوس فكانت اثمانا ولهذا كانت اثمانا عند مقابلتها بخلاف جنسها وعند مقابلتها بجنسها حالة المساواة وان كانت ثمنا فالثمن لا يتعين وان عين كالدراهم والدنانير فالتحق التعين فيهما بالعدم فكان بيع الفلس بالفلسين بغير اعيانهما وذا لا يجوز ولانها اذا كانت اثمانا فالواحد يقابل الواحد فبقى الآخر فضل مال لا يقابله عوض فى عقد المعاوضة وهذا تفسير الربا...

অর্থাৎ খাদ্যদ্রব্য ব্যতীত যেসব পণ্য কাছাকাছি পর্যায়ের গণনাযোগ্য ওই সব পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় সমজাতীয়কে সমজাতীয়ের বিনিময়ে অতিরিক্তসহ ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আবু ইউসুফের নিকট বৈধ। তবে এ ক্ষেত্রে আবশ্যকীয় হলো, লেনদেন হাতে হাতে হতে হবে। যথা এক পয়সার বিনিময়ে দুই পয়সার বিক্রি বৈধ। যখন বিনিময়দ্বয় নির্ধারিত হবে এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর নিকট উক্ত পদ্ধতির ক্রয়-বিক্রয় অবৈধ। কেননা, তাঁর মতে পয়সা হলো ছমন। সুতরাং দিরহাম-দিনারের মতো পয়সার ক্রয়-বিক্রয়ও অতিরিক্ত সহকারে বৈধ হবে না। পয়সার মধ্যে ছমন হওয়ার বৈশিষ্ট্যতার প্রমাণ হলো, এই যে, যেই সব বস্তু দ্বারা অন্যান্য বস্তুর মূল্যমানের পরিমাণ নির্ধারণ করা যায়। যথা দিরহাম-দিনার দ্বারা অন্যান্য বস্তুর মূল্যমান নির্ধারণ করা যায়। তদ্রূপ পয়সা দ্বারাও অন্যান্য বস্তুর মূল্যমান নির্ধারণ করা যায়। তাই পয়সাও ছমন। তাই পয়সাকে যখন তার ভিন্নজাতীয় কোনো পণ্যের বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় করা হয়, অথবা তার সমজাতীয়ের বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় করা হয় এবং বিনিময়দ্বয়ের মধ্যে সমতাও বিদ্যমান থাকে, তখন পয়সাকে ছমনই সাব্যস্ত করা হয়। আর পয়সা যতক্ষণ ছমন থাকবে, তা নির্ধারিত করা দ্বারা নির্ধারিত হবে না। যেমনটা দিরহাম-দিনারের ক্ষেত্রে। সুতরাং ছমনের মধ্যে নির্ধারিত হওয়ার বৈশিষ্ট্যতা না থাকার মতোই। তাই উপর্যুক্ত পদ্ধতিতেও অনির্ধারিত এক পয়সাকে অনির্ধারিত দুই পয়সার বিনিময়ে বিক্রয় করা হলো, যা অবৈধ। এটি এ জন্যও যে, এক পয়সা তো এক পয়সার বিনিময়ে হলো, অপর এক পয়সা বিনিময়বিহীন রয়ে যাবে। এটাই হলো সুদের ব্যাখ্যা। (বাদায়েউস সানায়ে)

ফিকহে হানাফীর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হেদায়াতে উল্লেখ রয়েছে–

ويجوز بيع الفلس بالفلسين اعيانهما عند ابى حنيفة وابى يوسفؒ قال محمد لايجوز لان الثمنية تثبت باصطلاح الكل فلا تبطل باصطلاحهما واذا بقيت اثمانا لا تتعين فصار كما اذا كانا بغير اعيانهما وكبيع الدرهم بالدرهمين۔ ولهما ان الثمنية فى حقهما تثبت باصطلاحهما اذلا ولاية للغير عليهما فتبطل باصطلاحهما واذا بطلت الثمنية تتعين بالتعيين ۔۔۔ فصار كالجوزة بالجوزتين بخلاف النقود لانها للثمنية خلقة۔

এর সারমর্ম উপরেই উল্লেখ করা হয়েছে, (আল হিদায়া মা'আল ফতহ ৬/১৬২)

এক পয়সাকে দুই পয়সার বিনিময়ে বিক্রয়ের সম্ভাব্য চারটি পদ্ধতি ফতহুল কাদীর ইত্যাদিতে উল্লেখ করা হয়েছে। যার মধ্যে তিনটা পদ্ধতি সর্বসম্মতভাবে হারাম ও অবৈধ। অবশিষ্ট একটা পদ্ধতি মতানৈক্যপূর্ণ, যার পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা পূর্বে সবিস্তারে উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লিখিত চার পদ্ধতি নিম্নরূপ–

(ক) অনির্ধারিত এক পয়সাকে অনির্ধারিত দুই পয়সার বিনিময়ে বিক্রয়।

(খ) নির্ধারিত এক পয়সাকে অনির্ধারিত দুই পয়সার বিনিময়ে বিক্রয়।

(গ) অনির্ধারিত এক পয়সাকে নির্ধারিত দুই পয়সার বিনিময়ে বিক্রয়।

(ঘ) নির্ধারিত এক পয়সাকে নির্ধারিত দুই পয়সার বিনিময়ে বিক্রয় করা।

উল্লিখিত চার পদ্ধতির মধ্যে প্রথম তিন পদ্ধতি সর্বসম্মতভাবে হারাম ও অবৈধ। চার নং পদ্ধতিটি বৈধ হওয়া না হওয়া মতবিরোধপূর্ণ। (ফতহুল কাদীর ৬/১৬২)

পয়সার ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে বিলম্বে পরিশোধ (Defferd payment) বৈধ হওয়া বিষয়ে আল্লামা সারাখসী (রহ.)-এর বক্তব্য–

اذا اشترى الرجل فلوسا بدراهم ونقد الثمن ولم تكن الفلوس عند البائع فالبيع جائز لان الفلوس الرائجة ثمن كالنقود وقد بينا ان حكم العقد فى الثمن وجوبها ووجودها معا ولا يشترط قيامها فى ملك بائعها لصحة العقد كما لا يشترط ذلك فى الدراهم والدنانير۔

অর্থাৎ যখন কোনো ব্যক্তি দিরহামের বিনিময়ে পয়সা ক্রয় করবে এবং ছমন হিসেবে দিরহাম পরিশোধ করে দেবে, এবং বিক্রিত পয়সা ক্রেতার নিকট উপস্থিত না থাকে তাহলে উক্ত পদ্ধতির ক্রয়-বিক্রয় বৈধ। কেননা প্রচলিত পয়সা নুকুদের মতো ছমন। আমরা পূর্বেই

উল্লেখ করেছি যে, ছমনের মধ্যে আকদের হুকুম হলো শুধুমাত্র তা পরিশোধ করা ওয়াজিব হওয়া এবং অস্তিত্বময় হওয়া এবং ছমনটা আকদের সময় বিক্রেতার নিকট উপস্থিত থাকা আকদ যথার্থ হওয়ার জন্য জরুরি নয়। যেমনটা দিরহাম-দিনারের ক্ষেত্রেও এটা শর্ত নয়। (আল মাবছূত ৪/২৪)

আল্লামা সারাখসী (রহ.) অন্য এক মাসআলার শেষে লেখেন যে,

وبيع الفلوس بالدراهم ليس بصرف

অর্থাৎ পয়সার ক্রয়-বিক্রয় দিরহামের সাথে বাঈ ছরফ নয়। (প্রাগুক্ত)

যখন আকদের বিনিময়দ্বয়ের মধ্যে একদিকে দিরহাম হবে অপরদিকে পয়সা হবে তখন তা বাঈ ছরফ হবে না। সুতরাং বিনিময়দ্বয়ের মধ্যে উভয় দিকে যদি পয়সা হয়, তাহলে তা বাঈ ছরফ হওয়ার প্রশ্নই আসে না।

উপরিউক্ত বক্তব্য দ্বারা এ কথা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.)-এর নিকট পয়সার ক্রয়-বিক্রয় বাঈ ছরফ নয়।

এ বিষয়ে মালেকী মাযহাবের বক্তব্য ও তাদের দৃষ্টিভঙ্গি :

হযরত ইমাম মালেক (রহ.) তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আল মুদাওয়ানাতুল কুবরা নামক গ্রন্থে লেখেন-

قلت ارأيت ان اشترى فلوسا بدراهم فافترقنا قبل ان نتقابض قال لا يصلح هذا فى قول مالك وهذا فاسد قال لى مالك لا خير فيها نظرة بالذهب ولا بالورق ولو ان الناس اجازوا بينهم الجلود حتى تكون لها سكة وعين لكرهتها ان تباع بالذهب والورق نظرة. قلت ارأيت ان اشتريت خاتم فضة او خاتم ذهب او تبر ذهب بفلوس فافترقنا قبل ان نتقابض ايجوز هذا فى قول مالك: قال لا يجوز فلس بفلسين قال الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد وربيعة انهما كرها الفلوس بالفلوس وبينهما فضل او نظرة وقالا انها صارت سكة مثل سكة الدنانير والدراهم.

অর্থাৎ আমি বললাম–আপনি বলেন তো, আমি যদি দিরহামের বিনিময়ে পয়সা ক্রয় করি এবং তার ওপর কবজ করা ব্যতীত পৃথক হয়ে যায়। তিনি বললেন, উক্ত পদ্ধতি ইমাম মালেকের মতানুসারে বৈধ হবে না এবং উক্ত আকদ ফাসেদ। আমাকে ইমাম মালেক (রহ.) বলেছেন যে, পয়সা যদি স্বর্ণ-রৌপ্যের বিনিময়ে বাকি হয়, তাহলে উক্ত লেনদেনের কোনো কল্যাণ নেই এবং মানুষ যদি চামড়ার মাধ্যমে তাদের লেনদেন শুরু করে দেয়। এমনকি তা মুদ্রায় পরিণত হয়। তাহলে আমি উক্ত চামড়াকে স্বর্ণ-রৌপ্যের বিনিময়ে বাকিতে লেনদেনকেও মাকরুহ বলব। আমি বললাম, আপনি এটা বলুন যে, আমি যদি পয়সার বিনিময়ে স্বর্ণ বা রৌপ্যের আংটি ক্রয় করি এবং এর ওপর কবজ করা ব্যতীত পৃথক হয়ে যায়। এটা কি ইমাম মালেক (রহ.)-এর নিকট বৈধ হবে? তিনি বলেন, উক্ত পদ্ধতি ইমাম মালেকের নিকট বৈধ হবে না। কেননা ইমাম মালেক (রহ.) বলেছেন, এক পয়সাকে দুই পয়সার বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় অবৈধ। হযরত লাইছ ইবনে সা'আদ, ইয়াহয়া ইবনে সাঈদ এবং রবী'আ থেকে রেওয়ায়াত করেন যে, উভয়ে পয়সাকে পয়সার বিনিময়ে ওই লেনদেনকে মাকরুহ বলেন, যাতে একটা বিনিময়ের ওপর অপর বিনিময়ের অতিরিক্ততা ও বিলম্বে পরিশোধ পাওয়া যাবে। তারা আরো একধাপ এগিয়ে বলেন, পয়সা ও দিরহাম-দিনারের মতো মুদ্রায় রূপান্তরিত হয়ে গেছে। (আল মুদাওয়ানাতুল কুবরা ৩/৫-৬)

وقال مالك: اكره ذلك فى الفلوس ولا اراه حراما كتحريم الدنانير والدراهم قلت ارأيت ان اشتريت فلسا بفلسين ايجوز هذا عند مالك قال لا يجوز فلس بفلسين.

অর্থাৎ এবং ইমাম মালেক (রহ.) বলেন, আমি পয়সার মধ্যে উক্ত লেনদেনকে মাকরুহ মনে করি। তবে উক্ত লেনদেনকে দিরহাম-দিনারের লেনদেনের মতো হারাম মনে করি না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তাহলে আপনি বলুন, ইমাম মালেকের মাযহাব মতে এক পয়সাকে দুই পয়সার বিনিময়ে বিক্রয় করা বৈধ হবে? তিনি বললেন, এক পয়সাকে দুই পয়সার বিনিময়ে বিক্রয় করা বৈধ হবে না। (প্রাগুক্ত)

উক্ত গ্রন্থে আরো উল্লেখ আছে যে-

الليث عن يزيد بن ابى حبيب وعبيد الله بن ابى جعفر قالا : وشيوخنا كلهم انهم كانوا يكرهون صرف الفلوس بالدنانير والدراهم الا يدا بيد وقال يحيى بن ايوب : قال يحى بن سعيد اذا صرفت درهما فلوسا فلا تفارقه حتى تأخذ كله.

অর্থাৎ আমাদের সমস্ত মাশায়েখগণ পয়সাকে দিরহাম-দিনারের সাথে বাঈ ছরফ করাকে অপছন্দ করেছেন তবে বিনিময়দ্বয়ের লেনদেন হাতে হাতে হলে করা যাবে। (প্রাগুক্ত)

মালেকী মাযহাবের ইমামদের উপর্যুক্ত বক্তব্য দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তাদের নিকট প্রাধান্য হলো বাঈ ছরফ হওয়ার জন্য, প্রকৃতিগত ছমন হওয়া জরুরি নয়। বরং পয়সার ক্রয়-বিক্রয়ও বাঈ ছরফের অন্তর্ভুক্ত এবং এতেও বিনিময়দ্বয়ের ওপর তাৎক্ষণিক কবজ করা জরুরি। উক্ত লেনদেনে বিলম্বে পরিশোধও অবৈধ।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ বসুন্ধরা, ঢাকায় অনুষ্ঠিত "লা-মাযহাবী ফিতনা প্রতিরোধে উলামায়ে কেরামের করণীয়" শীর্ষক ৫ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রদত্ত সায়্যিদ মুফতী মাসূম সাক্বিব ফয়জাবাদী কাসেমী সাহেবের যুগান্তকারী তাকরীর

লা-মাযহাবী ফিতনা : বাস্তবতা ও আমাদের করণীয়-৯

নামাযে হাত বাঁধার মাসআলা
সিনার ওপরে না নিচে

লা-মাযহাবীদের সাথে যে কয়টি বিষয়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মূল মতবিরোধ, তন্মধ্যে একটি হচ্ছে নামাযে হাত বাঁধার মাসআলা। হাত কোথায় বাঁধবে? এ সম্পর্কে পূর্বেও উম্মাহর চার মাযহাবে কিছুটা মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর অনুসারীরা নামাযে হাত বেঁধে থাকেন নাভির ওপর (সিনার ওপর নয়)। আর হানাফী মাযহাবের অনুসারীরা হাত বেঁধে থাকেন নাভির নিচে। পূর্ববর্তী যুগে এই দুই মাযহাবেরই প্রচলন ছিল। পূর্ববর্তী যুগে রচিত কিতাবসমূহে এ মতামতদ্বয়ের স্বপক্ষেই প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু লা-মাযহাবীরা এ ক্ষেত্রে তৃতীয় একটি মতের আবিষ্কার করেছে। তাদের মতে, নামাযে হাত বাঁধবে বুকের ওপর। অনেক অতিউৎসাহী লা-মাযহাবী তো আরো কয়েক ধাপ এগিয়ে। তারা হাত বাঁধে গণ্ডদেশের নিচে, সিনার ওপর। সোনালি যুগের তের শ বছর পর নব আবিষ্কৃত সুন্নাতের(!) ওপর আমল করতে কথিত আহলে হাদীসদের অপরিমেয় কসরত দেখে সত্যিই করুণা হয়! এরা কখনো হাত বাঁধে বুকের ওপর, কখনো সিনার ওপর! সে এক লেজে-গোবরে হ-য-ব-র-ল কিমাকার দৃশ্য! সমগ্র উম্মাহর জন্য তাদের কী অনির্বচনীয় দরদ। সবাইকে সমবেত করতে হবে একই পতাকাতলে! এ মহৎ লক্ষ্য সাধনে তাদের কী জ্বালাময়ী লেকচার এবং হাঁসফাঁস! কিন্তু তাদের পাঁচজনের নামাযের হাত বাঁধার ধরনে আকাশ-পাতালের তফাত। অথচ যাদের মুশরিক এবং বিদ'আতী হিসেবে খিস্তিখেউর করতে করতে তাদের গলার পানি শুকিয়ে যাওয়ার উপক্রম, অর্থাৎ মাযহাবপন্থীরা তাদের সবার হাত বাঁধার ধরন কিন্তু এক ধরনের 'হানাফীরা নাভির নিচে আর শাফেয়ীরা নাভির ওপরে। ব্যস!

সিনার ওপর হাত বাঁধার স্বপক্ষে লা-মাযহাবীদের প্রমাণাদি

লা-মাযহাবীরা সিনার ওপর হাত বাঁধার পক্ষে তিনটা হাদীস উপস্থাপন করে থাকে! তবে সহীহ ইবনে খোযায়মার একটি হাদীসের প্রতিই তাদের সবার দৃষ্টি নিবদ্ধ। কোনো রকমে টেনেহিঁচড়ে ওই হাদীসটা পর্যন্ত প্রতিপক্ষকে নিয়ে যেতে পারলে যেন তাদের কেল্লাফতে! ইবনে খোযায়মার হাদীসটা নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করছি।

তাদের তৃতীয় হাদীসটি হচ্ছে–

عن طاؤس قال كان رسول الله ﷺ يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشبك بهما على صدره وهو فى الصلاة

অর্থাৎ, প্রখ্যাত তাবেঈ হযরত তাউস (রহ.) বলেন, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নামাযে ডান হাত বাম হাতের ওপর রেখে উভয় হাতকে সিনার ওপর বাঁধলেন।" এই হাদীসটা সম্পর্কে প্রথম কথা হচ্ছে, হাদীসটা মুরসাল। (মুরসাল ওই হাদীসকে বলে, যেখানে তাবেঈ কোনো সাহাবীর মধ্যস্থতা ছাড়া সরাসরি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে হাদীস বর্ণনা করবে। এখানেও হযরত তাউস (রহ.) কোনো সাহাবীর মধ্যস্থতা ছাড়া সরাসরি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন লা-মাযহাবীদের কীর্তিমান পুরুষ নাসীরুদ্দীন আলবানী হযরত তাউসের মুরসালকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। (সিলসিলাতুল আহাদিসিজ জায়িফা ওয়াল মাওজুআ ২/২৯)

আর লা-মাযহাবীরা তো কোনো মুরসাল হাদীসকেই গ্রহণ করতে প্রস্তুত না। সে হিসেবে হাদীসটা দিয়ে প্রমাণ উপস্থাপন করা লা-মাযহাবী সুহৃদদের জন্য শোভনীয় নয়। সাথে সাথে এই হাদীসের দুজন বর্ণনাকারী হচ্ছেন সুলাইমান ইবনে মুসা এবং হায়ছম ইবনে হুমাইদ।

সুলাইমানকে ইমাম বোখারী (রহ.), ইমাম নাসাঈ (রহ.) এবং ইমাম আবু হাতেম (রহ.) দুর্বল বর্ণনাকারী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। আর হায়ছম ইবনে হুমাইদকে ইমাম আবু দাউদ এবং আবু মুছহির দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ তো গেল তৃতীয় হাদীসের আলোচনা।

তাদের প্রথম হাদীসটা হচ্ছে–

عن وائل قال: صليت مع رسول الله ﷺ فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره

অর্থ: হযরত ওয়ায়েল (রা.) বলেন, আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে নামায আদায় করেছি। তিনি ডান হাতকে বাম হাতের ওপর রেখে বুকের ওপর হাত বাঁধলেন। (সহীহ ইবনে খোযায়মাহ ১/৪৭৯)

উক্ত হাদীসের ধারা-পরম্পরায় মুয়াম্মাল ইবনে ইসমাঈল নামে একজন

বর্ণনাকারী রয়েছে। তার সম্পর্কে কিছু যশস্বী মুহাদ্দিসের মন্তব্য শুনুন। ইমাম বোখারী (রহ.) বলেন, সে মুনকারুল হাদীস। আর যে বর্ণনাকারী সম্পর্কে ইমাম বোখারী (রহ.) মুনকারুল হাদীস বলেন, তার থেকে হাদীস বর্ণনা করা বৈধ হবে না।

ইমাম আবু হাতেম (রহ.) বলেন, বর্ণনাকারী হিসেবে তিনি সত্যবাদী, সুন্নাতের ব্যাপারে অনমনীয়। কিন্তু তার বর্ণনাগত প্রমাদ এবং ভুল-ভ্রান্তি অজস্র। (আল জরহু ওয়াত তা'দীল ৮/১৭০৯)

ইমাম আবু যুরআ (রহ.) বলেন, তার হাদীসে প্রচুর ভুল-ত্রুটি রয়েছে। (আত তারজামা ৪/৮৯৪৯)

ইবনে সা'আদ (রহ.) বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য, তবে ভুলের পরিমাণ প্রচুর। (তবকাতে ইবনে সাআদ ৫/৫০১)

ইবনে হাজর (রহ.) তার সম্পর্কে ইমাম দারা কুতনী (রহ.) থেকে একই ধরনের মন্তব্য বর্ণনা করেছেন। (তাহযীব ১০/৩৮১)

وقال غيره دفن كتبه فكان يحدث من حفظه فكثر خطائه

মুহাদ্দিসীনরা তার অধিক ভুলের কারণ উল্লেখ করেছেন যে, তার সমস্ত কিতাব মাটিচাপা দেওয়া হয়। এর পরে সে আপন স্মৃতিশক্তি থেকে হাদীস বর্ণনা করত। ফলে স্বাভাবিকভাবে তার ভুল-ভ্রান্তি হতো। লা-মাযহাবীদের মান্যবর ইমাম নাসিরুদ্দীন আলবানী পর্যন্ত মুয়াম্মালকে দুর্বল বর্ণনাকারী আখ্যা দিয়েছেন। মুয়াম্মালের মৃত্যুর পর তার কবরের এপিটাফে লিখে দেয়া হয়, সে স্মৃতিশক্তি থেকে হাদীস বর্ণনা করত। ফলে তার ভুল-ত্রুটি হতো।

মুহাদ্দিসীনদের উল্লিখিত মন্তব্য থেকে তার সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসে তা হলো, তিনি দুর্বল বর্ণনাকারী কিংবা বর্ণনাকারী হিসেবে সত্যবাদী হলেও অধিক পরিমাণে ভুল করতেন। মুয়াম্মালের অন্যতম শিক্ষক, জগৎখ্যাত ফকীহ ও মুহাদ্দিস সুফইয়ান ইবনে উয়াইনা (রহ.) নিজেও নাভির নিচে হাত বাঁধতেন। (আল মাজমু ৩/২৫৯)

যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসরা একপক্ষে আর দুর্বল মুয়াম্মাল একপক্ষে, ইনসাফের দৃষ্টিতে একটু বলুন তো, কাদের পাল্লা ভারী হবে? এবং কারা সত্যের অধিক নিকটবর্তী হবেন?

এখানে নাসিরুদ্দীন আলবানীর কুকীর্তি দেখুন! আলবানী এই হাদীসটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন। আলবানীর কাজই ছিল, যে হাদীসটিকে মুহাদ্দিসীনরা সর্মসম্মতিক্রমে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন, সে হাদীস যদি লা-মাযহাবীদের স্বপক্ষে হয়, তাহলে ওই হাদীসটিকে শুদ্ধ করতে তার কী অনির্বচনীয় তোড়জোড় এবং অপরিমেয় প্রচেষ্টা? অথচ পূর্বেই বলা হয়েছে, আলবানী অন্যত্র মুয়াম্মালকে দুর্বল আখ্যায়িত করেছেন। তাহলে এখানে মুয়াম্মাল থাকা সত্ত্বেও হাদীসটা কিভাবে শুদ্ধ হয়ে যায়? এ কেমন দ্বিমুখী নীতি? প্রবঞ্চক এবং স্বার্থান্ধ লোকদের পক্ষেই কেবল এ ধরনের দ্বিপক্ষীয় নীতি অবলম্বন সম্ভব।

আলবানীর অন্ধ অনুকরণ

লা-মাযহাবীরা একদিকে তাকলীদে শাখছী শিরক শিরক বলে পুরো জগৎকে প্রকম্পিত করে তোলে, অন্যদিকে তলে তলে তারাও এই রোগে (তাদের ভাষ্য মতে তাকলীদে শাখছী মারাত্মক রোগ) আক্রান্ত। এর একটা নমুনা দেখুন, মুসলিমের একটি হাদীসে আছে,

عن جبير بن مطعم انه قال ايام التشريق ايام ذبح

এই হাদীসটি লা-মাযহাবীদের কাছে সহীহ। এর স্বপক্ষে তাদের একমাত্র দলিল, صححه الالبانى এই হাদীসটিকে আলবানী সহীহ বলেছেন। ব্যস, আর কী চাই? নাসিরুদ্দীন আলবানীর স্বীকৃতি মানেই তো কেল্লাফতে! এ কোন ধরনের আত্মপ্রসাদ! লা-মাযহাবী সুহৃদরা এ কর্মকাণ্ডটিকে পুনর্বিবেচনা করবেন কী? অন্ধ অনুকরণের প্রকৃষ্ট উদাহরণ পেশ করতে চাইলে এটাই তো সবচেয়ে বড় উদাহরণ। আলবানীর বক্তব্য গ্রহণ করতে গিয়ে সমস্ত হাদীস বিশারদের বক্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করে দেয়া। এটাই তো কোরআন-হাদীসে নিষিদ্ধ অন্ধ অনুকরণ! যাতে তোমরা লিপ্ত আছো। আল্লাহর রহমতে আমরা সে ধরনের অন্ধ অনুকরণ থেকে যোজন-যোজন দূরে। এজন্য আমি প্রায় বলি, লা-মাযহাবীদের গাইরে মুকাল্লিদ এই অর্থে বলা হয় যে, তারা বিশ্বখ্যাত চার মাযহাবের অনুসরণ করে না। অন্যথায় তারা তো আমাদের চেয়ে অনেক বেশি লোকের অনুসরণ করে থাকে। যত দিন পর্যন্ত তারা সঠিক পথে ফিরে আসবে না এবং চার মাযহাবের একনিষ্ঠ অনুসারী হবে না, তত দিন পর্যন্ত তাদের ওপর কলঙ্কের এই তিলক সাঁটা থাকবে। কারণ উম্মাহর সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শুধুমাত্র চার ইমামের তাকলীদই জায়েয এবং চার মাযহাবের অনুসারীরাই সঠিক আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অনুসারী। চার মাযহাবের অনুসরণ ব্যতিরেকে অন্য কারো অনুসরণ করলে যেমন গাইরে মুকাল্লিদের তকমা মুছে যাবে না, তেমনি সঠিক আহলে সুন্নাতের অনুসারীও হওয়া যাবে না।

আজমগড়ের একটা চমকপ্রদ ঘটনা

ইন্ডিয়ার আজমগড় লা-মাযহাবীদের অভয়ারণ্যে পরিণত হয়েছে। সেখানে অনেক লা-মাযহাবীদের অবস্থান। তারা সেখানে অনেক মাদরাসাও প্রতিষ্ঠা করেছে। মাওলানা আহমদুল্লাহ, তিনি সেখানকার একজন উদ্যমী আলেম, আমাদের ঘনিষ্ঠ সুহৃদ, তিনি শায়খ আব্দুল হক দা. বা. এর দীর্ঘদিন সংস্রবপ্রাপ্ত শিষ্য। তিনি আমাদেরকে একটা চমকপ্রদ ঘটনা শোনালেন।

তাদের গ্রামে 'ছেহদী' নামে জনৈক কসাই বসবাস করত। লা-মাযহাবীরা তাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে নানা ধরনের প্রলোভন এবং তাদের সবচেয়ে বিষাক্ত কিন্তু মনোহর টোপ হাদীসের ওপর আমল করার দোহাই দিয়ে তাকে লা-মাযহাবী বানিয়ে ফেলে। এদিকে যখন সে লা-মাযহাবী হয়ে গাঁটের পয়সা দুই হাত খুলে পানির মতো খরচ করতে লাগল, তখন আর তার নাগাল পায় কে? সে সবাইকে টক্কর দিয়ে হয়ে গেল কমিটির সর্বেসর্বা তথা চেয়ারম্যান। ওই এলাকার প্রতিটি মাহফিল-সেমিনারের সেই মধ্যমণি। তার সভাপতিত্বই মজলিশের সৌন্দর্যবর্ধনের প্রধান নেয়ামক। এদিকে তার নামেও এসেছে আমূল পরিবর্তন। কোথাকার অজপাড়া গায়ের অখ্যাত 'ছেহদী' এখন আর ছেহদী নেই, বরং তিনি এখন লা-মাযহাবীদের আধ্যাত্মিক পুরোধা শায়খ ছেহদী হাফিজাহুল্লাহ। কিন্তু এত কিছুর পরও বিধিবাম। সে যতই তার নামের আগেপিছে টাইটেলের ঝড় তুলুক, কিন্তু কাজের কাজ যে কিছুই হচ্ছে না। তার অতীতের সহকর্মীরা তথা বর্তমানের শিষ্য তাদের মুখ থেকে কোনো মতেই শায়খ 'ছেহদী' হাফিজাহুল্লাহ বের করা সম্ভবপর হচ্ছে না। সবাই তাকে দেখলে সেই ছেহদী কসাই নামে ডাকতে আরম্ভ করে। এ নিয়ে তার দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। সে নিজে যখন এর কোনো কূলকিনারা করতে পারছে না, তখন সে লা-মাযহাবীদের আলেমদেরকে দাওয়াত দিল। তারা সমবেত হলে তিনি তাদের সম্বোধন করে বললেন, খুব ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের ডেকেছি। আমি আপনাদের সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক রাহবর, কিন্তু লোকে যখন আমাকে 'ছেহদী' কসাই নামে সম্বোধন করে, তখন আমার ইজ্জত-সম্মানের লালিত সৌধটি যেন ধুলায় মিশে যায়। ইচ্ছে করে আত্মহননের মতো কাজে প্রবৃত্ত হই। কিন্তু আপনাদের অসহায় চেহারার দিকে থাকিয়ে তা কি করতে পারি? আপনারাই বলুন? পুরো মজলিশে না না রব ওঠে। এরপর তিনি বললেন, তাহলে আমার জন্য একটা বিহিত করুন। আমাকে নিষ্কৃতি দিন। এ ছেঁড়াখোঁড়া আমি আর সহ্য করতে পারছি না। আপনারা সবাই আমার জন্য একটা চমৎকার নামের ব্যবস্থা করুন। আমার এই বিশ্রী নামের পরিবর্তে একটা সুন্দর নামের ব্যবস্থাও করতে না পারলে আপনাদের জন্য এত বেগার খেটে লাভটা কী? লা-মাযহাবী আলেমরা তাকে পরামর্শ দিল, আপনি এলাকার সমস্ত লা-মাযহাবীকে দাওয়াত করে বাসায় জমায়েত করুন। তাদের জন্য খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করুন। ওই দিনই সমবেত জনতার সামনে আমরা আপনার জন্য এটা অনিন্দ্য সুন্দর নামের ব্যবস্থা করব। পরামর্শ মতে, তার বাসায় দাওয়াত দেয়া হলো। সে এক এলাহী কাণ্ড। অনেক লোকের সমাগম। সবাই খাবার-দাবার খেয়ে যখন পান খাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে, তখন এক লা-মাযহাবী আলেম সবাইকে সম্বোধন করে বলল–শ্রোতাবৃন্দ, আপনারা আমাদের এই নৃপতিকে আর 'ছেহদী কসাই' নামে ডাকবেন না। আজ থেকে তাকে আপনারা 'সুরাখ মুহাম্মদ' নামে সম্বোধন করবেন। মাওলানা আহমদুল্লাহ বলেন, ছেহদী বলুন, আর সুরাখ মুহাম্মদ বলুন, সে তো পূর্বের সেই 'ছেহদী কসাই'।

ঠিক তেমনি লা-মাযহাবীরা যত দিন চার মাযহাবের অনুসরণপূর্বক সঠিক পথে ফিরে না আসে, তত দিন তাদেরকে গাইরে মুকাল্লিদ নামেই সম্বোধন করা হবে। এতক্ষণ পর্যন্ত তাদের প্রথম এবং তৃতীয় হাদীস সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো।

এবার তাদের দ্বিতীয় হাদীসটি দেখুন :

عن هلب الطائى قال رايت النبى ﷺ ينصرف عن يمينه وعن يساره ورأيته قال يضع هذه على صدره ووصف يحيى اليمنى على اليسرى فوق المفصل

হযরত হালব তায়ী (রহ.) বলেন, আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে দেখেছি, তিনি ডান দিক এবং বাম দিকে মনোযোগী হতেন। হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে আমি আরো দেখেছি, তিনি এটিকে সিনার ওপর রাখতেন। এটি থেকে কী উদ্দেশ্য? বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এই হাদীসের একজন বর্ণনাকারী ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ বলেন, ডান হাতকে বাম হাতের গিরার ওপর রেখেছেন।

লা-মাযহাবীদের জালিয়াতি

হযরত হালব (রা.) সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাযাহ, দারে কুতনী, তাবারানী, বায়হাকী, মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ নামক হাদীসের গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু কোথাও বুকে হাত বাঁধার আলোচনাই নেই। (দেখুন, মুসনাদে আহমদ ৫/২২৬,২২৭, তাবারানী ২২/১৬৫,১৬৭, দারা কুতনী ১/২৮৫, বায়হাকী ২/২৯৫) এ হাদীসটি মুসনাদে আহমদে কয়েক স্থানে বর্ণিত হয়েছে। এক সনদে এসেছে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ডান হাত বাম হাতের ওপর রাখতেন। অপর একটি বর্ণনায় এসেছে, এক হাত অপর হাতের ওপর রাখতেন। অবশ্য মুসনাদে আহমদের এক বর্ণনায় আছে, يضع هذه على هذه এখানে দ্বিতীয় هذه কে অনুলিখক ভুলবশত على صدره লিখে দিয়েছেন। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো, হাদীসের বিখ্যাত গ্রন্থ কানযুল উম্মাল, মাজমাউয যাওয়ায়েদ প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে মুসনাদের সকল যিয়াদাত

(সিহাহ সিত্তার বাইরের বর্ণনাগুলো) একত্রিত করা হয়েছে। অথচ এসব গ্রন্থে صدره শব্দটি নেই। লা-মাযহাবীদের অন্যতম পুরোধা মৌলভী সানাউল্লাহর জালিয়াতি দেখুন! তিনি প্রথম هذه কে পরিবর্তন করে يده শব্দ যুক্ত করে দিয়েছেন। ফলে বাহ্যত হাদীসটি এমন হয়ে গেছে يضع يده على صدره। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র হাদীসে এমন জঘন্য বিকৃতি ও নিজের কু'মতলব চরিতার্থ করার হীনস্বার্থে সংযোজন করা কোনো সাধারণ মুমিনের জন্যও কি সম্ভব? হ্যাঁ, শুধু লা-মাযহাবীদের পক্ষেই সম্ভব। কারণ আমরা পূর্বে তথ্য-উপাত্ত দিয়ে প্রমাণ করেছি, কোনো হাদীস যখনই লা-মাযহাবীদের স্বার্থের পরিপন্থী হবে, তখনই ওই হাদীসের বিকৃতি সাধন এবং ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টি করাটা লা-মাযহাবীদের মজ্জাগত অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

নাভির নিচে হাত বাঁধা সম্পর্কীয় হাদীস আহনাফের দলিল

আমি সর্বপ্রথম এ সম্পর্কে ইমাম বোখারীর সম্মানিত শিক্ষক ইবনে আবী শাইবা প্রণীত হাদীসের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা থেকে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করিছ। উল্লেখ্য, আমি সামনে মুসান্নাফের যে উদ্ধৃতি দেব, তার অধিকাংশই আরব বিশ্বের স্বনামধন্য মুহাদ্দিস শাইখ আওয়ামা দা.বা কর্তৃক গবেষণাকৃত মুসান্নাফের উদ্ধৃতি।

প্রথম হাদীসটি দেখুন :

عن وائل بن حجر قال رأيت النبى ﷺ وضع يمينه على شماله فى الصلاة تحت السرة

অর্থ : হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর (রা.) বলেন, আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে নামাযে ডান হাত বাম হাতের ওপর রেখে নাভির নিচে রাখতে দেখেছি। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা হা. ৩৯৫৯)

হাদীসটির সনদ সম্পর্কীয় আলোচনা

আরব বিশ্বের মান্যবর ইমাম শাইখ আওয়ামা দা. বা. এই হাদীসের সনদের পর্যালোচনা করে বলেন, হাদীসটির সনদ সহীহ (বিশুদ্ধ)। হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার আল্লামা ইবনে হুমামের (রহ.) অন্যতম শিষ্য আল্লামা কাসেম ইবনে কুতলুবুগা (রহ.) স্বীয় গ্রন্থ "আত তারীফ ওয়াল আখবার" এ হাদীসটি সনদ, মতনসহ উল্লেখ করে বলেন, সনদটি অত্যন্ত মজবুত। আল্লামা আবেদ সিন্ধী (রহ.) 'তাওয়ালি'উল আনওয়ার' নামক গ্রন্থে এই হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন, এই সনদের সব বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য। একজনও দুর্বল রাবী নেই। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ৩/৩২০)

দ্বিতীয় হাদীসটি দেখুন :

عن ابراهيم النخعى انه قال يضع يمينه على شماله فى الصلاة تحت السرة

প্রখ্যাত তাবেঈ ইবরাহীম নাখাঈ (রহ.) বলেন, নামাযে ডান হাত বাম হাতের ওপর রেখে নাভির নিচে বাঁধবে। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ৩৯৬৯, এর সনদটি হাসান)

দেখুন, এই দুই বর্ণনায় تحت السرة (নাভির নিচে) স্পষ্ট আছে।

আল্লামা নীমভী (রহ.) ও আছারুস সুনান নামক গ্রন্থে تحت السرة সম্বলিত বর্ণনাটিকে সহীহ আখ্যায়িত করেছেন। আর على صدره (বুকের ওপর) এই শব্দটিকে غير محفوظ (সংরক্ষিত নয়) আখ্যায়িত করেছেন।

এখানেও জালিয়াতি

আব্দুর রহমান মুবারকপুরী, (১৮৬৫,১৯৩৫ খৃ:) লা-মাযহাবীদের অন্যতম পুরোধা। তিরমিযী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ তুহফাতুল আহওয়াযীর প্রণেতাও তিনি। আপনারা সবাই মাশাআল্লাহ যথেষ্ট বিদ্বান লোক। তুহফাতুল আহওয়াযী খুলে দেখবেন। তিনি উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করে মন্তব্য করেন,

لكنه جيد لكنه لم يثبت

অর্থ: হাদীসের সনদ শুদ্ধ হলেও হাদীসটি প্রমাণিত নয়, কত বড় খেয়ানত! নিজে স্বীকার করলেন, হাদীসের সনদ বিশুদ্ধ, কিন্তু তার পরও প্রলাপ বকছেন, হাদীসটি প্রমাণিত নয়। আর তাদের স্বপক্ষের على صدره সম্বলিত বর্ণনাটির সাফাই গাইতে তিনি যেন খেই হারিয়ে ফেলেছেন।

ভ্রান্তির বেড়াজাল

تحت السرة সম্বলিত বর্ণনাটির তাদের যেন চক্ষুশূলে পরিণত হয়েছে। না পারছে গিলতে, না পারছে ফেলতে! এই হাদীস সম্পর্কে তাদের অভিযোগ আর ভ্রান্তির কোনো অন্ত নেই। সবচেয়ে বড় ধোঁকা এটা দেয়, ইবনুত তুরকুমানী এই হাদীস বর্ণনা করার সময় تحت السرة শব্দটি উল্লেখ করেননি। ফল দাঁড়াল এটা যে, تحت السرة র বর্ণনাটি সংরক্ষিত নয় এবং নাভির নিচে হাত বাঁধা সুন্নাতও নয়। আর على صدره র বর্ণনাটি বিশুদ্ধ এবং সুন্নাত। আল্লাহ উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন আল্লামা শাইখ আওয়ামাকে। তিনি মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবার আটটি প্রাচীন কপি সামনে রেখে গ্রন্থটির বিশদ বিশ্লেষণ করেন, যা সর্বমহলে ভূয়সী প্রশংসিত হয়। ওই আট কপির দুইটা কপিতে, যার একটা শায়খ মুহাম্মদ আবেদ সিন্ধীর (রহ.) এবং অপরটি শাইখ মুরতাজা যুবায়দীর, تحت السرة শব্দটি স্পষ্ট আছে। তিনি ওই দুই কপির সরাসরি প্রতিবিম্ব নিজের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এখানে এ ধরনের অভিযোগ উত্থাপন সম্পূর্ণ অবান্তর যে, تحت السرة শব্দটি হয়তো এডিটিংয়ের সময় সংযোজন করা হয়েছে, মূল কপিতে তা ছিল না।

কারণ, চোরে চোরে মাসতুতো ভাই! সব চোরই অন্যকে চোর ভাবতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। যেহেতু লা-মাযহাবীদের এটা মজ্জাগত অভ্যাস যে, কোনো কিতাবে গবেষণা করার সময় তাতে বিকৃতি সাধন কিংবা ভুল সংযোজন না করলে যেন তাদের ভাতই হজম হয় না। তাই অন্যদের এডিটিংয়েও তাদের খুব একটি ভরসা থাকার কথা নয়। কিন্তু লা-মাযহাবীরা মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবার একটা কপি পাকিস্তান থেকে প্রকাশ করেছে। সেখানে তারা এই পরিচ্ছেদকেই সম্পূর্ণভাবে বাদ দিয়ে ফেলেছে। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়েছে বয়রুত থেকে প্রকাশিত কপিতেও।

আবু দাউদ শরীফ নিয়ে বিভ্রান্তি

এই হাদীসের উদ্ধৃতি দেয়ার ক্ষেত্রে আমাদের অনেক কিতাবে আবু দাউদ শরীফের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এখানে লা-মাযহাবীরা এই বলে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে, আবু দাউদ শরীফে আমরা তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখেছি, সেখানে تحت السرة সম্বলিত কোনো বর্ণনাই নেই।

বন্ধুরা! আপনারা অবশ্যই জানেন, আবু দাউদ শরীফের কয়েকটি নুসখা (কপি) রয়েছে। উপমহাদেশে প্রচলিত আবু দাউদ শরীফের বর্ণনাকারী হচ্ছেন লু'লুয়ী (রহ.)। তাঁর বর্ণনাকৃত নুসখায় تحت السرة র বর্ণনাটি নেই। তবে আল্লামা ইবনে দাসা (রহ.)-এর বর্ণনাকৃত আবু দাউদে تحت السرة শব্দটি রয়েছে।

লা-মাযহাবীদের দ্বৈতনীতি

এখানে লা-মাযহাবীরা আল্লামা ইবনে দাসা (রহ.)-এর কঠোর সমালোচনায় মেতে ওঠে। তাদের সমালোচনার মূল কারণ, যাতে তার বর্ণনাকৃত আবু দাউদ গ্রহণযোগ্যতা এবং সমাদৃতা হারিয়ে ফেলে। ফলে তাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জিত হবে। ফলে এটাই প্রমাণিত হবে, تحت السرة শব্দটি আবু দাউদের বর্ণনায় নেই। কিন্তু একই লা-মাযহাবীদের কুকীর্তি এবং দ্বৈতনীতি দেখুন! এখানে তো তারা লু'লুয়ীর বর্ণনাকৃত আবু দাউদের গুণকীর্তন এবং ইবনে দাসার বর্ণনাকৃত আবু আবু দাউদের সমালোচনা করে থাকে, কিন্তু রফয়ে ইয়াদাইনের ক্ষেত্রে তারা তাদের ভোল সম্পূর্ণভাবে পাল্টে ফেলে। কারণ লু'লুয়ীর বর্ণনাকৃত আবু দাউদে আমাদের পক্ষে সমর্থন পাওয়া যায়। কারণ সেখানে আছে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একবার মাত্র রফয়ে ইয়াদাইন করেছেন। এখানে এসে তারা লু'লুয়ীর বর্ণনাকৃত আবু দাউদের সমালোচনায় মুখর এবং ইবনে দাসার বর্ণনাকৃত আবু দাউদের গুণকীর্তনে পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে। এসব এমন দ্বৈতনীতি এবং সাংঘর্ষিক মন্তব্য কেবল চরম স্বার্থান্ধের পক্ষেই সম্ভব। অবশ্যই লা-মাযহাবীদের কাছে ধর্মের এসব নীতি কথার খুব একটি গুরুত্ব থাকার কথা নয়।

লা-মাযহাবীরা কি আহলে সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত

আমাদের জনসাধারণ এমনকি অনেক আলেম পর্যন্ত এই ধোঁকায় লিপ্ত যে, লা-মাযহাবীদের সাথে এত বাদানুবাদ আর বিতর্কের প্রয়োজন কী? চার মাযহাব যেমন সত্য এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অন্তর্ভুক্ত তেমনি লা-মাযহাবীরা নতুন মতাদর্শের প্রবক্তা হলেও আহলে সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। তাদের সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়ে মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ শক্তি ক্ষয় করাটা উচিত হচ্ছে না।

আল্লাহু আকবর! উপরোক্ত মন্তব্যটি যদি সত্য হতো, তাহলে তো আমরাও তাদেরকে অভিবাদন জানাতাম। তাদেরকে সাদরে গ্রহণ করতাম। কিন্তু একটু গভীরভাবে পর্যালোচনা এবং যাচাই-বাছাই করলে এ কথা আমার সুহৃদদের সামনে প্রতিভাত হয়ে যাবে, লা-মাযহাবীরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের স্বচ্ছ এবং খাঁটি মতাদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে অবস্থানকারী একটা স্বতন্ত্র মতাদর্শাবলম্বী। তাদের প্রতিষ্ঠার ইতিহাসটা একটু গভীরভাবে নিরীক্ষা করলেই বোঝা যায়, মূলত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মৌলিক চেতনায় কুঠারাঘাত এবং সমূলে বিনাশের জন্যই তাদের উদ্ভব এবং বিকাশ ঘটেছে। তারা কস্মিনকালেও আহলে সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। তারা হাদীসের ওপর আমল করার ছদ্মাবরণে জনসাধারণকে সুন্নাহর সোনালি রাজপথ থেকে ভ্রান্তি এবং ভ্রষ্টতার অকূল পাথারে ভাসিয়ে দিচ্ছে।

মুহতারাম হাজিরীন!

অনেক দীর্ঘ আলোচনা হয়ে গেল। নাভির নিচে হাত বাঁধা সম্পর্কে আরো কয়েকটি হাদীস, সাহাবীদের আমল এবং তাবেঈদের কর্মধারা নিম্নে উল্লেখ করছি, যাতে আপনারা বুঝতে পারেন, আলহামদুলিল্লাহ আমাদের আমলটাই সুন্নাহর অধিক নিকটবর্তী।

(১) হযরত আলী (রা.) বলেন,

ان من السنة فى الصلوة وضع الاكف على الاكف فى الصلوة تحت السرة

অর্থ : নামাযে সুন্নাত হলো, তালু হাতের পিঠের ওপর রেখে নাভির নিচে রাখা। (মুসনাদে আহমদ, ১/১১০, দারা কুতনী ১/২৮৫, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হা. ৩৯৬৬, ইবনে দাসার বর্ণনাকৃত আবু দাউদ ৭৫৬) এই সনদে আবু শাইবা আব্দুর রহমান ইবন ইসহাক আল ওয়াসেতী নামে একজন বর্ণনাকারী রয়েছেন। যদিও তিনি দুর্বল রাবী, কিন্তু পূর্বে উল্লেখ্য হাদীসদ্বয় এই হাদীসের সমর্থন করায় তার ওই দুর্বলতা দূর হয়ে গেছে।

(২)عن وائل قال قال ابو هريرة اخذ

قال اسحاق تحت السرة اقوى فى الحديث واقرب الى التواضع

অর্থ : হযরত ইসহাক (রহ.) (যিনি ইমাম বোখারী (রহ.)-এর অন্যতম শিক্ষক) বলেন, নাভির নিচে হাত বাঁধার হাদীস অধিক শক্তিশালী এবং বিনয়ের অধিক নিকটবর্তী। (আল আওসাত ৩৩২৪৩)

প্রিয় হাজিরীন!

হাদীসে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবাদের আমল, তাবেঈদের আমল এবং উম্মাহর ধারাবাহিক কর্মপরম্পরা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম, নাভির নিচে হাত বাঁধাটাই দলিল প্রমাণের ভিত্তিতে অধিক শক্তিশালী এবং বিনয়ের নিকটবর্তী।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

গ্রন্থনা ও অনুবাদ

হাফেজ রিদওয়ানুল কাদির উখিয়াভী।

الاكف على الاكف تحت السرة (رواه ابو داود فى نسخة ابن الاعرابى ٢٨٠/١)

অর্থ : হযরত আবু ওয়ায়েল (রহ.) বলেন, হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বলেছেন, নামাযে এক হাতের তালু অপর হাতের তালুর ওপর রেখে নাভির নিচে হাত বাঁধবে। (আবু দাউদ হা. ৭৫৮)

(৩)اخبرنا حجاج بن حسان قال سمعت ابا مجلز او سئلته قال قلت كيف يضع؟ قال يضع باطن كف يمينه على ظاهر كف شماله ويجعلها اسفل من السرة۔

অর্থ : হাজ্জাজ ইবনে হাসসান (রহ.) বলেন, আমি আবু মিজলায (রহ.) কে বলতে শুনেছি, অথবা হাজ্জাজ বলেন, আমি আবু মিজলাযকে জিজ্ঞাসা করলাম, যে, নামাযে কিভাবে হাত বাঁধতে হয়? তিনি প্রত্যুত্তরে বললেন, ডান হাতের তালু বাম হাতের তালুর পিঠের ওপর রেখে নাভির নিচে রাখবে। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হা. ৩৯৬৩, ইমাম মারদীনী (রহ.) স্বীয় গ্রন্থ 'জাওহারুন নাকীতে' আবু মিজলাযের এই উক্তি সম্পর্কে মন্তব্য করেন, سنده جيد এর সনদ উত্তম ২/৩১)

(৪)عن انسؓ قال ثلاث من اخلاق النبوه تعجيل الافطار وتاخير السحور ووضع اليد اليمنى على اليد اليسرى فى الصلاة تحت السرة۔

অর্থ : হযরত আনাস (রা.) বলেন, তিনটি কাজ নবীদের আদর্শের অন্তর্ভুক্ত। ১. তাড়াতাড়ি ইফতার করা। ২. বিলম্ব করে সাহরী খাওয়া। ৩. নামাযে ডান হাত বাম হাতের ওপর রেখে নাভির নিচে হাত বাঁধা। (আল মুহাল্লা৩/৩০)

(৫) আল্লামা ইবনুল মুনযির (রহ.) লিখেছেন-

মাসিক আল-আবরারের গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলি

এজেন্ট হওয়ার নিয়ম

*	কমপক্ষে ১০ কপির এজেন্সি দেয়া হয়।
*	২০ থেকে ৫০ কপি পর্যন্ত ১টি, ৫০ থেকে ১০০ পর্যন্ত ২টি, আনুপাতিক হারে সৌজন্য কপি দেয়া হয়।
*	পত্রিকা ভিপিএলে পাঠানো হয়।
*	জেলাভিত্তিক এজেন্টদের প্রতি কুরিয়ারে পত্রিকা পাঠানো হয়। লেনদেন অনলাইনের মাধ্যমে করা যাবে।
*	২৫% কমিশন দেয়া হয়।
*	এজেন্টদের থেকে অগ্রীম বা জামানত নেয়া হয় না।
*	এজেন্টগণ যেকোনো সময় পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করে অর্ডার দিতে পারেন।

গ্রাহক হওয়ার নিয়ম
বার্ষিক চাঁদার হার

	দেশ	সাধ.ডাক	রেজি.ডাক
#	বাংলাদেশ	৩০০	৩৫০
#	সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮০০	১০০০
#	মধ্যপ্রাচ্য	১১৮০	১৩০০
#	মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া	১৩০০	১৫০০
#	ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া	১৬০০	১৮০০
#	আমেরিকা	১৮০০	২১০০

১ বছরের নিচে গ্রাহক করা হয় না। গ্রাহক চাঁদা মনিঅর্ডার, সরাসরি অফিসে বা অনলাইন ব্যাংকের মাধ্যমে পাঠানো যায়।

ব্যাংক অ্যাকাউন্ট :

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

আল-আবরার-৪০১৯১৩১০০০০০১২৯

আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

আল-আবরার-০৮৬১২২০০০০৩১৪

মাযহাব প্রসঙ্গে ডা. জাকির নায়েকের অপপ্রচার-৮

মাও. ইজহারুল ইসলাম আলকাওসারী

ইসলামে মতানৈক্য বা মতভেদ

ডা. জাকির নায়েক চার মাযহাবকে কোরআনে নিষিদ্ধ ফেরকাবাজি বা দলাদলির অন্তর্ভুক্ত মনে করেছেন। তিনি তাঁর বক্তব্যের প্রমাণ হিসেবে পবিত্র কোরআনের দুটি আয়াত উল্লেখ করেছেন এবং দুটি আয়াতের ক্ষেত্রেই তিনি আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা করে চার মাযহাবকে কোরআনে নিষিদ্ধ ফেরকাবাজির অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আয়াত দুটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আলোচনার পূর্বে আমরা ইসলামে মতানৈক্য বা মতভেদ সম্পর্কে আলোচনা করব।

আরবী ভাষায় 'মতানৈক্য বা মতপার্থক্য বোঝাতে' 'ইখতিলাফ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

আর ইখতেলাফের পারিভাষিক অর্থ হলো,

الاختلاف والمخافة ان ينهج كل شخص طريقا مغايرا للآخر فى حاله او فى قوله

"ইখতিলাফ বা মতানৈক্য হলো, বিশেষ কোনো অবস্থা কিংবা বক্তব্যের ক্ষেত্রে একে অপরের বিপরীত বিষয়টি গ্রহণ করা।"

মতানৈক্য বা মতপার্থক্য একটি স্বতঃসিদ্ধ বিষয়। আল্লাহ পাক মানুষের বর্ণ, ভাষা, চাহিদা-রুচি সবক্ষেত্রে ভিন্নতা দিয়ে মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। সবচেয়ে বড় বিষয় হলো, প্রত্যেকের রয়েছে নিজস্ব বিবেচনা বুঝশক্তি। বুদ্ধি-বিবেচনার পার্থক্যের কারণে মানুষের চিন্তাচেতনায় সেই পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। তবে কিছু বিষয় এমন রয়েছে, যে ক্ষেত্রে মতানৈক্য আবশ্যক বা ফরয। কিছু বিষয় এমন রয়েছে, যে ক্ষেত্রে মতানৈক্য হারাম। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মতানৈক্য বৈধ সীমার মধ্যে থাকে। কোনো ক্ষেত্রে মতানৈক্যই কল্যাণের কারণ হয়ে থাকে। ইসলামী শরীয়তে বিষয়টির ব্যাপকতার কারণে প্রত্যেক বিষয়ের মতানৈক্যের সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো–

প্রবৃত্তিতাড়িত মতানৈক্য

কখনও মতানৈক্য মানুষের প্রবৃত্তির তাড়নায় সৃষ্টি হয়ে থাকে।

এ ক্ষেত্রে যেহেতু প্রবৃত্তির ইচ্ছাই মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে, এজন্য এ ধরনের মতানৈক্য কল্যাণকর কিছু থাকে না। এ সম্পর্কে কোরআনের দৃষ্টিভঙ্গি হলো,

আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনের সূরা নিসার ১৩৫ নং আয়াতে বলেছেন,

فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا

"ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে আপনি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না"

পবিত্র কোরআনের সূরা আন-আমের ৫৬ নং আয়াতে আল্লাহ পাক বলেছেন,

قل لا أتبع اهواء كم قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين

"হে নবী! আপনি বলুন, আমি তোমাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করব না, আর যদি আমি তোমাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করি, তবে আমি পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ব। অথচ আমি হেদায়াতপ্রাপ্তদের একজন।"

যেহেতু স্বেচ্ছাচারিতা ও নফসের কামনার বহুবিধ দিক রয়েছে এবং এর উৎস প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তিত হয়, এজন্য বিষয়টি খুবই নাজুক। বাহ্যিক কিছু নিদর্শনের সাহায্যে বিষয়টি নিরূপণ করা সম্ভব। যেমন–

১. মতানৈক্যের বিষয়টি সরাসরি কোরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট ও স্বতঃসিদ্ধ বিষয়ের বিরোধী হওয়া। (যেখানে দ্বিমত পোষণের কোনো সুযোগ নেই)

২. পূর্বসূরিদের অনুসৃত পথ, যার ওপর ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার বিষয়ে কারও দ্বিমত নেই, সে ব্যাপারে বিপরীত বক্তব্য পেশ করা, যার কোনো প্রমাণ সরাসরি কোরআন, হাদীস, ইজমা, কিয়াস কোনোটিতে বিদ্যমান নেই।

৩. সুস্থ বিবেক যে বিষয়টি অসম্ভব ও অবৈধ মনে করে। যেমন–এমন মতবাদ, যাতে যেনা-ব্যভিচার, সমকামিতা ইত্যাদিকে বৈধতা দেওয়া হয়েছে।

সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত মতানৈক্য

যে মতাক্যে মানুষের অভ্যন্তরীণ ইচ্ছাশক্তি প্রবল থাকে না। বরং যা নিরেট সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত, যে ক্ষেত্রে কারও স্বার্থচিন্তার লেশমাত্রও থাকে না–এ ধরনের বিষয়ে মতানৈক্য করা আবশ্যক। যেমন, অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে একজন মুসলমানের মতানৈক্য। তাদের আক্বীদা-বিশ্বাস ও রীতিনীতির সাথে একজন মুসলমানের মতানৈক্য আবশ্যক। এ ব্যাপারে কোনো প্রকার শিথিলতার কোনো অবকাশ নেই।

মনে রাখতে হবে, তাদের সাথে মতানৈক্যের অর্থ এই নয় যে, তাদেরকে সত্যের দিকে আহ্বান করা এবং সত্যকে গ্রহণ করার ব্যাপারে কোনো বাঁধানিষেধ রয়েছে। তারা তাদের কুফরী, শিরকী, বিদআতী আক্বীদা ত্যাগ করে ইসলামের সুস্পষ্ট বাণীকে গ্রহণ করার ব্যাপারে কোনো মতানৈক্য নেই। বরং মতানৈক্যের মূল বিষয় হলো, ইসলামের সঠিক আক্বীদা-বিশ্বাস এবং তাদের ভ্রান্ত আক্বীদা-বিশ্বাসের মাঝে।

দোদুল্যমান মতানৈক্য

যে সমস্ত বিষয়ে মতানৈক্যের ক্ষেত্রে ভালো-মন্দ উভয়ের সম্ভাবনা থাকে যেমন শাখাগত মাসআলা-মাসাইলের মাঝে ইখতেলাফ, এ ধরনের মতানৈক্য দোদুল্যমান। এখন যদি মতানৈক্য দলিলের দাবি অনুযায়ী, তার আদব এবং সুনির্দিষ্ট মূলনীতির আলোকে হয়ে থাকে এবং দলিলের আলোকে সত্য গ্রহণের উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে, তবে তা অবশ্যই প্রশংসনীয় এবং ইসলামী আইনশাস্ত্রের বহুমুখী সম্ভাবনার একটি উত্তম উৎস হিসেবে পরিগণিত হবে। আর যদি কোনো মূলনীতি اصـــــــــول ছাড়া, ইখতেলাফের আদব রক্ষা ছাড়া, এ ধরনের মতানৈক্য করা হয়, তবে অবশ্যই তা নিন্দনীয় ও পরিত্যাজ্য হবে।

ফিকহশাস্ত্রে অসংখ্য মাসআলায় উলামায়ে কেরামের মাঝে মতভেদ রয়েছে। যেমন নামাযে সূরা ফাতেহা শেষে জোরে আমিন বলা, ইমামের পিছে মুক্তাদীর ক্বিরাত পড়া, রক্ত বের হলে ওযু ভাঙা ইত্যাদি।

এ সমস্ত বিষয়ের মতভেদ দোদুল্যমান। কেননা সাধারণভাবে এটি প্রশংসনীয়। কিন্তু কেউ যদি অন্যকে পরাজিত করার উদ্দেশ্যে কিংবা প্রবৃত্তিতাড়িত হয়ে এ ধরনের মতানৈক্যে লিপ্ত হয়, তবে তা অবশ্যই নিন্দনীয় হবে।

এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয় হলো, মতানৈক্যের যে সমস্ত আদব রয়েছে, সেগুলো রক্ষা করা হচ্ছে কি না। যদি মতানৈক্যের আদব রক্ষা না করে মতানৈক্য করা হয়, তবে এ ধরনের মতানৈক্য গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা যখনই সে মতানৈক্যের মাঝে অমূলক উক্তি ও শিষ্টাচারবহির্ভূত ভাষা ব্যবহার করবে, তখন স্পষ্ট হয়ে উঠবে, সত্য অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে মূলত এ মতানৈক্য নয়। বরং এটি প্রবৃত্তি পূজার অংশ। যেমন–শায়খ মুহাম্মাদ আওয়ামাহ তার বিখ্যাত কিতাব, আসরুল হাদিসিশ শরীফ-এর ভূমিকায় লিখেছেন, এক লা-মাযহাবী যুবক তার নিকট এসে মতভেদপূর্ণ বিভিন্ন মাসআলা-মাসাইলে সম্পর্কে আলোচনা শুরু করে এবং বড় বড় আলেমদের নাম বিকৃত করে উচ্চারণ করতে থাকে। যেমন, আল্লামা ইবনুল হুমাম (রহ.)-এর নাম সে ব্যঙ্গ করে, ইবনুল হাম্মাম (বাথরুমের ছেলে) বলে।

অতএব, শাখাগত মাসআলা-মাসাইলে মতভেদের ক্ষেত্রে আবশ্যকভাবে মুসলমানদের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব, ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখতে হবে। শাখাগত মাসআলায় মতভেদ যদি মুসলমানদের মাঝে হিংসা-দ্বেষ ও পারস্পারিক দ্বন্দ্বের কারণ হয়, তবে নিঃসন্দেহে তা নিন্দনীয় ও পরিত্যাজ্য।

একটি ভুল সংশোধন :

বাংলাদেশে ইসলামের মুল ইবাদাতে শাখাগত মাসআলায় কোনো মতানৈক্য নেই। কারণ বাংলাদেশ কেন উপমহাদেশের সকল মুসলমানই হানাফী। তারা সকলে ইসলামের মূল ইবাদাতসমূহের শাখাগত বিষয়ে একই পথ ও পদ্ধতি অনুসরণ করে চলছে শত শত বছর ধরে। উলামায়ে কেরাম এর গবেষণা করে কোরআন-হাদীসের অকাট্য দলিল জেনে অটল অবিচলভাবে একই পদ্ধতিতে দ্বীন পালন করে আসছেন। শত শত বছর ধরে চলে আসা এহেন মহা ঐক্যের মধ্যে যদি কেউ এসে নতুন চিন্তাচেতনা ও আমলের পদ্ধতির প্রচার চালায় এবং ওসব বিষয়কে হাতিয়ার বানিয়ে মুসলমানদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করতে চায়, তা হবে একান্তই পরিকল্পিতভাবে একপক্ষীয় ফেরকাবাজি করা। যদি উপমহাদেশের মুসলমানগণ তাদের এহেন ফেরকাবাজি থেকে মুসলমানদের রক্ষাকল্পে কোরআন-হাদীস ও শরীয়তের দলিলের ভিত্তিতে আলোচনা করে তাদের মুখোশ উন্মোচন করে, তা হবে এ দেশের মুসলমানদের জন্য দ্বীনি দায়িত্ব পালনে সচেতনতা। কারণ এসব হলো মুসলমানদেরকে ফেরকা সৃষ্টি থেকে বাঁচানো।

উসুলে দ্বীন বা দ্বীনের মৌলিক বিষয়ে মতপার্থক্য

দ্বীনের যে সমস্ত বিষয় অকাট্য প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত, সেগুলোর ব্যাপারে মতানৈক্য বা মতপার্থক্যের কোনো সুযোগ নেই। অকাট্য প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত এ সকল বিষয়ে যেই দ্বিমত পোষণ করবে, সেই কাফের হয়ে যাবে।

উদাহরণ :

১. আল্লাহর অস্তিত্ব।

২. আল্লাহর একত্ববাদ।

৩. আল্লাহর প্রেরিত নবী-রাসূলদের প্রতি বিশ্বাস।

৪. আল্লাহর প্রেরিত কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস।

৫. ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস।

৬. মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের ওপর বিশ্বাস।

৭. তাকদীরের ওপর বিশ্বাস।

অর্থাৎ যে সমস্ত বিষয় মৌলিক আক্বীদার সাথে সম্পর্কিত, সেগুলোর ব্যাপারে যদি কেউ মতানৈক্য করে, তবে যে সঠিক অবস্থানে থাকবে, সে মু'মিন আর যে ভুল অবস্থানে থাকবে, সে কাফের।

অকাট্য প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত শাখাগত বিষয়

দ্বীনের শাখাগত যে সমস্ত বিষয় অকাট্য প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত, এ সমস্ত বিষয়ে কেউ যদি মতানৈক্য করে, তবে সেও কাফের হয়ে যাবে।

উদাহরণ :

১. নামায, রোযা, হজ, যাকাত এগুলো

ফরয হওয়া।
২. যেনা হারাম হওয়া।
৩. মদ হারাম হওয়া ইত্যাদি।

শাখাগত মাসআলা-মাসায়েলে মতপার্থক্য

দলিল অস্পষ্ট থাকার কারণে শাখাগত মাসআলা-মাসায়েলে মতপার্থক্য সর্বসম্মতিক্রমে বৈধ, বরং অনেক ক্ষেত্রে তা উম্মতের জন্য রহমত ও প্রশস্ততার কারণ।

এ ব্যাপারে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যামানায় বনী কুরায়যার ঘটনা সুস্পষ্ট প্রমাণ। এছাড়া সাহাবীরা এ ব্যাপারে একমত ছিলেন যে, তাদের মধ্যে শাখাগত মাসআলা-মাসায়েলের বিষয়ে যে মতানৈক্য রয়েছে, যেমন, ইবাদাত, বিবাহ, উত্তরাধিকার সম্পত্তি বণ্টন, দান, রাজনীতি ইত্যাদি, এ সমস্ত ক্ষেত্রে প্রত্যেক সাহাবী তার ইজতেহাদ অনুযায়ী আমল করবে।

ইসলামে শাখাগত মাসআলা-মাসায়েলে যে মতানৈক্য রয়েছে, এটি মূলত মুসলিম উম্মাহের জন্য রহমত ও প্রশস্ততার কারণ।

শাখাগত বিষয়ে মতপার্থক্য উম্মতের জন্য রহমতস্বরূপ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَهْمَا أُوتِيتُمْ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ فَالْعَمَلُ بِهِ لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ فِي تَرْكِهِ .فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللّٰهِ فَسُنَّةٌ مِنِّي مَاضِيَةٌ .فَإِنْ لَمْ تَكُنْ سُنَّةٌ مِنِّي فَمَا قَالَ أَصْحَابِي .إِنَّ أَصْحَابِي بِمَنْزِلَةِ النُّجُومِ فِي السَّمَاءِ , فَأَيُّمَا أَخَذْتُمْ بِهِ اهْتَدَيْتُمْ ,وَاخْتِلَافُ أَصْحَابِي لَكُمْ رَحْمَةٌ

"তোমাদেরকে আল্লাহর কিতাব প্রদান করা হয়েছে, সুতরাং তার ওপর আমল করা আবশ্যক। সেটি ত্যাগ করার ব্যাপারে কারও কোনো আপত্তি গ্রহণযোগ্য নয়। যদি বিষয়টি আল্লাহর কিতাবে না থাকে, তবে আমার সুন্নাতের অনুসরণ করবে। যদি আমার পক্ষ থেকে কোনো সুন্নাত না থাকে, তবে আমার সাহাবীরা যা বলে তার ওপর আমল করবে। আমার সাহাবীরা আকাশের তারকাতুল্য। তাদের মধ্য থেকে যাকেই অনুসরণ করবে, হেদায়াত পেয়ে যাবে। আমার সাহাবীদের মতপার্থক্য তোমাদের জন্য রহমত। (আল কিফায়া ফী ইলমির রুওয়াত ১/১১৬, আল মাদখাল ইলাস সুনানিল কুবরা লিল বায়হাকী ১/১১৩)

১. আল্লামা ইবনু আব্দিল বার (রহ.) "জামিউ বয়ানিল ইলমি ওয়াফাজলিহি" নামক কিতাবে লিখেছেন,

رُوِيَ عَنْ بَعْضِ التَّابِعِينَ مِنْ مِثْلِ قَوْلِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ :لَقَدْ نَفَعَ اللّٰهُ بِاخْتِلَافِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَعْمَالِهِمْ ,لَا يَعْمَلُ الْعَامِلُ بِعَمَلِ رَجُلٍ مِنْهُمْ إِلَّا رَأَى أَنَّهُ فِي سَعَةٍ

"তাবেঈ কাসেম বিন মুহাম্মাদ (রহ.)-এর উক্তি বর্ণিত আছে, তিনি বলেন–

আমলের ক্ষেত্রে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাহাবীগণের মধ্যে যে মতানৈক্য রয়েছে, আল্লাহ তা'আলা তার মাঝে মানুষের উপকার নিহিত রেখেছেন। সাহাবীদের কোনো একজনের আমল অনুযায়ী কেউ যদি আমল করে, তবে সে ব্যাপক প্রশস্ততা দেখতে পাবে।" (জায়ে বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাজলিহী লি ইবনে আব্দিল বার হা. ১০৫২)

عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ :مَا أُحِبُّ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللّٰهِ لَمْ يَخْتَلِفُوا ;لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ قَوْلًا وَاحِدًا كَانَ النَّاسُ فِي ضِيقٍ , وَأَنَّهُمْ أَئِمَّةٌ يُقْتَدَى بِهِمْ ,فَلَوْ أَخَذَ أَحَدٌ بِقَوْلِ رَجُلٍ مِنْهُمْ كَانَ فِي سَعَةٍ .

উমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাহাবায়ে কেরাম মতপার্থক্য না করুক, এটি আমি পছন্দ করি না। কেননা যদি একটি মত থাকত, তবে মানুষ সংকীর্ণতায় নিপতিত হতো। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাহাবীগণ হলেন, হেদায়াতপ্রাপ্ত ইমাম; যাঁরা আমাদের অনুসরণীয়। কেউ যদি তাদের কোনো একজনের কোনো বক্তব্যের ওপর আমল করে, তবে সে ব্যাপক প্রশস্ততার মাঝে থাকবে। (প্রাগুক্ত)

وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ :اخْتِلَافُ أَهْلِ الْعِلْمِ تَوْسِعَةٌ ,وَمَا بَرِحَ الْمُفْتُونَ يَخْتَلِفُونَ ,فَيُحَلِّلُ هَذَا وَيُحَرِّمُ هَذَا ,فَلَا يَعِيبُ هَذَا عَلَى هَذَا ,وَلَا هَذَا عَلَى هَذَا

.

হযরত ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ (রহ.) বলেন,

"উলামায়ে কেরামের মাঝে মতপার্থক্য প্রশস্ততার কারণ। যুগে যুগে মুফতীগণ (দলিলের ভিত্তিতে) মতানৈক্য করেছেন। সুতরাং কারও নিকট একটি বিষয় জায়েয, অপরের নিকট তা হারাম; অথচ তারা একে অপরকে এ কারণে দোষারোপ করেন না।" (আল মকাসিদুল হাসানা লিসসাখাবী ১/৫৮ হা. ৩৯, কাশফুল খেফা ১/৭৩ হা. ১৫৩)

وَقَالَ ابْنُ عَابِدِينَ : الِاخْتِلَافُ بَيْنَ الْمُجْتَهِدِينَ فِي الْفُرُوعِ -لَا مُطْلَقِ الِاخْتِلَافِ -مِنْ آثَارِ الرَّحْمَةِ فَإِنَّ اخْتِلَافَهُمْ تَوْسِعَةٌ لِلنَّاسِ .قَالَ :فَمَهْمَا كَانَ الِاخْتِلَافُ أَكْثَرَ كَانَتْ الرَّحْمَةُ

أَوْفَرَ

আল্লামা ইবনু আবিদীন (রহ.) বলেছেন, শাখাগত মাসআলার ক্ষেত্রে দুজন মুজতাহিদের মধ্যকার মতপার্থক্য রহমতস্বরূপ। অন্যান্য বিষয়ের মতানৈক্য এর ব্যতিক্রম। কেননা শাখাগত মাসআলায় মতানৈক্য হওয়াটা মূলত মানুষের জন্য প্রশস্ততার দ্বার উন্মোচন।" (হাশিয়ায়ে ইবনে আবেদীন ১/৪৬, রাদ্দুল মুহতার ১/১৬৮)

তিনি আরও বলেন, সুতরাং মাসআলা-মাসায়েলে মতপার্থক্য যত বেশি হবে, রহমতের ধারা তত ব্যাপক হবে।"

যুগশ্রেষ্ঠ আলেম, হাফেযে হাদীস আল্লামা জালালুদ্দিন সূয়ূতী (রহ.) বলেছেন,

اعلم أن اختلاف المذاهب فى الملة نعمة كبيرة ، وفضيلة عظيمة ، وله سر لطيف أدركه العالمون ، وعمى عنه الجاهلون ، حتى سمعت بعض الجهال يقول :النبى (صلى الله عليه و على آله و سلم) جاء بشرع واحد ، فمن أين مذاهب أربعة ؟ . !

"মুসলিম উম্মাহের মাঝে বিভিন্ন মাযহাব থাকা আল্লাহর পক্ষ থেকে অনেক বড় নেয়ামত এবং এর তাৎপর্য ও মর্যাদাও ব্যাপক। বিভিন্ন মাযহাব সৃষ্টির মাঝে সূক্ষ্ম রহস্য নিহিত আছে, যা আলেমগণ অনুধাবন করে থাকেন এবং অজ্ঞ লোকেরা এ ব্যাপারে অন্ধ থেকে যায়। এমনকি আমরা কোনো কোনো মূর্খ লোকের মুখে শুনে থাকি, হুজুর (সা.) এক শরীয়ত নিয়ে এসেছেন। সুতরাং চার মাযহাব কোত্থেকে উদয় হলো?"

(জাযিলুল মাওয়াহিব ফি ইখতিলাফিল মাযাহিব, পৃষ্ঠা-২৫)

তিনি আরও বলেন,

وقد وقع الاختلاف فى الفروع بين الصحابة (رضى الله عنهم و ارضاهم) ، وهم خير الأمة ، فما خاصم أحد منهم أحداً ، ولا عادى أحد أحداً ، ولا نسب أحد أحداً إلى خطأ ولا قصور

"সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর মাঝে শাখাগত মাসআলা-মাসায়েলের ব্যাপারে মতভেদ হয়েছে; অথচ তারা উম্মতের মাঝে শ্রেষ্ঠ মানব। তারা একে অপরের সাথে এ বিষয়ে বিবাদে লিপ্ত হতেন না এবং কেউ কারও প্রতি শত্রুতা পোষণ করতেন না এবং এক সাহাবী আরেক সাহাবীকে ভ্রান্ত কিংবা ত্রুটিযুক্ত মনে করতেন না।" (প্রাগুক্ত)

এ আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে, মাসআলা-মাসায়েলের ক্ষেত্রে যে মতানৈক্য রয়েছে, সেটি উম্মতে মুসলিমার জন্য রহমতস্বরূপ। অথচ ডা. জাকির নায়েক দ্বীনের মৌলিক বিষয়ে মতানৈক্য এবং শাখাগত বিষয়ে মতানৈক্যকে একই পাল্লায় মেপেছেন এবং উভয়টিকে হারাম মনে করেছেন। ফলশ্রুতিতে তিনি মাযহাবী মতানৈক্যকেও হারাম মতানৈক্যের অন্তর্ভুক্ত মনে করেছেন, যা একটি চরম ভ্রান্তি।

শাখাগত বিষয়ে সাহাবীদের মাঝে মতভেদ

সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর মাঝে শাখাগত বিভিন্ন মাসআলা-মাসায়েলে মতপার্থক্য ছিল। এখানে এ ধরনের মতপার্থক্যের কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করা হলো–

২. তাকবীরে তাশরীকের ব্যাপারে সাহাবীদের মাঝে মতভেদ ছিল।

(আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা (ফতোয়ায়ে আলমগীর), খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৮৫)

৩. ইহরাম বাঁধা অবস্থায় বিবাহ করা যাবে কি না, এ ব্যাপারে মতভেদ ছিল।

৪. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের তাশাহুদ ভিন্ন।

৫. আমীন আস্তে বলা, জোরে বলা নিয়ে মতভেদ ছিল।

৬. হাত উঠানো, না উঠানোর বিষয়ে মতভেদ ছিল।

৭. কোনো কোনো সাহাবী নামাযে বিসমিল্লাহ পড়তেন, কোনো কোনো সাহাবী নামাযে বিসমিল্লাহ পড়তেন না। [মাজমুউল ফাতাওয়া]

৮. কোনো কোনো সাহাবী নামাযে জোরে আওয়ায করে "বিসমিল্লাহ" পড়তেন, কোনো কোনো সাহাবী আস্তে আওয়ায করে বিসমিল্লাহ পড়তেন। কেউ কেউ ফজরের নামাযে কুনুতে নাযেলা পড়তেন, কেউ কেউ তা পড়তেন না। (তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং ৪০৩)

৯. কোনো কোনো সাহাবী সিঙ্গা, বমি ইত্যাদিতে ওযু করতেন, কোনো কোনো সাহাবী ওযু করতেন না। [মাজমুউল ফাতাওয়া, আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ.) খণ্ড-২৩, পৃষ্ঠা-৩৭৫]

১০. কোনো কোনো সাহাবী পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে এবং কামোত্তেজনাসহ মহিলাদেরকে স্পর্শ করলে ওযু করতেন, কোনো কোনো সাহাবী ওযু করতেন না। [মাজমুউল ফাতাওয়া, আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ.), খণ্ড-২০, পৃষ্ঠা-৫২৪]

১১. কোনো কোনো সাহাবী আগুনে জ্বালানো খাবার খেলে ওযু করতেন কোনো কোনো সাহাবী করতেন না।

(হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা, শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলভী (র.), খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১০১)

১২. কোনো কোনো সাহাবী উটের গোশত খেলে ওযু করতেন, কোনো কোনো সাহাবী করতেন না। [মাজমুউল ফাতাওয়া, খণ্ড-২৩, পৃষ্ঠা-৩৭৫]

শাখাগত বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে মতভেদ দূর করা অসম্ভব

ডা. জাকির নায়েকসহ অপরাপর

লা-মাযহাবীরা মনে করে থাকেন, মাযহাবের অনুসরণ পরিত্যাগ করে সরাসরি কোরআন ও হাদীস মানলে হয়তো কোনো মতপার্থক্য থাকবে না। কিন্তু তাদের এ ধারণা বাস্তবতার বিপরীত। চার ইমাম যেমন স্বেচ্ছায় কোনো মাসআলায় মতপার্থক্য করেননি বরং দলিলের দাবি অনুযায়ী তাদের মাঝে মতপার্থক্য হয়েছে, তেমনি হক্বপন্থী কোনো আলেমই স্বেচ্ছায় মতপার্থক্য করেন না। সুতরাং এ ধারণা পোষণ করা অমূলক যে, আধুনিক টেকনোলজির যুগে সমস্ত কিতাবাদি আমাদের নিকট বিদ্যমান রয়েছে, সুতরাং বর্তমানে কোনো মতানৈক্য হবে না। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো- লা-মাযহাবীর দাবিদার, যারা সব মাযহাব ভেঙে নিজেদের বানানো আধুনিক মাযহাবের দিকে দাওয়াত দিয়ে থাকে তাদের বিখ্যাত তিন আলেম শায়েখ আব্দুল্লাহ বিন বায (রহ.), শায়েখ সালেহ আল-উছাইমিন (রহ.) এবং শায়েখ নাসীরুদ্দিন আলবানী (রহ.)-এর মাঝে অসংখ্য মাসআলায় মতপার্থক্য। নিম্নে এ ধরণের কয়েকটি মাসআলা উল্লেখ করা হলো–

মাসআলা	ইবনে বায (রহ.)	ইবনে উছাইমিন (রহ.)	আলবানী (রহ.)
দাড়ি এক মুষ্টির বেশি হলে তা কাটার হুকুম	কোনো অবস্থাতেই দাড়ি কাটা জায়েয নয়, যদিও তা এক মুষ্টির বেশি হয়।	কোনো অবস্থাতেই দাড়ি কাটা জায়েয নয়।	সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর যুগ থেকে প্রচলিত সুন্নাত হলো, দাড়ি এক মুষ্টির বেশি হলে, তা কেটে ফেলা।
মৃত প্রাণীর চামড়া দাবাগাত করার হুকুম	যে সমস্ত প্রাণীর গোশত ভক্ষণ করা হয়, তাদের চামড়া দাবাগাত করার দ্বারা পবিত্র হবে। অন্যথায় তা পবিত্র হবে না।	যে সমস্ত প্রাণী জবাই করার দ্বারা হালাল হয়, সে সমস্ত প্রাণীর চামড়া দাবাগাত করার দ্বারা পবিত্র হবে। অন্যথায় তা পবিত্র হবে না।	যেকোনো চামড়া দাবাগাত করার দ্বারা পবিত্র হবে, যদিও তা শূকরের চামড়া হোক।
ওযুতে বিসমিল্লাহ পড়ার হুকুম।	উচ্চারণসহ ওযুতে বিসমিল্লাহ পড়া ওয়াজিব।	বিসমিল্লাহ পড়া সুন্নাত।	বিসমিল্লাহ পড়া ওয়াজিব।
ওযুতে ধারাবাহিকতা রক্ষার হুকুম	ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ওয়াজিব।	ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ওয়াজিব।	ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ওয়াজিব নয়।
নাপাকি অবস্থায় কোরআন স্পর্শ করার হুকুম।	নাপাকি ছোট হোক কিংবা বড়, কোনো অবস্থায় কোরআন স্পর্শ করা জায়েয নয়।	কোনো অবস্থায় কোরআন স্পর্শ করা জায়েয নয়।	যেকোনো নাপাকি অবস্থায় কোরআন স্পর্শ করা জায়েয।
অবজ্ঞা কিংবা অলসতাবশত নামায তরক কারীর হুকুম।	সুনিশ্চিতভাবে কাফের হয়ে যাবে।	সাধারণভাবে নামায তরককারী মুরতাদ হয়ে যাবে।	অলসতাবশত নামায তরককারী কাফের নয়।
মুক্তাদীর জন্য আমীন বলার হুকুম		ইমাম আমীন বললে মুক্তাদীর জন্য আমীন বলা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা।	ইমাম আমীন বললে মুক্তাদীর জন্য আমীন বলা ওয়াজিব।

জোরে আওয়াযবিশিষ্ট নামাযে মুক্তাদির জন্য সূরা ফাতিহা পড়ার হুকুম।	যেকোনো নামাযে মুক্তাদির জন্য সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব।	যেকোনো নামাযে মুক্তাদির জন্য সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব।	মুক্তাদি শুধু আস্তে আওয়াযবিশিষ্ট নামাযে সূরা ফাতিহা পড়বে। জোরে আওয়াযবিশিষ্ট নামাযে সূরা ফাতিহা পড়বে না। (কেননা এ হুকুমটি তাঁর নিকট রহিত)
পানাহার ব্যতীত অন্য কাজে স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্র ব্যবহারের হুকুম।	পানাহারসহ কোনো কাজেই স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্র ব্যবহার জায়েয নয়।	পানাহার ব্যতীত অন্যান্য কাজে স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্র ব্যবহার জায়েয।	স্বর্ণের পাত্র ব্যবহার করা হারাম। তবে পানাহার ব্যতীত অন্যান্য কাজে রৌপ্যের পাত্র ব্যবহার জায়েয।
রুকু থেকে দাঁড়িয়ে হাত বাঁধার হুকুম।	রুকু থেকে দাঁড়িয়ে বুকের ওপর হাত বাঁধা সুন্নাত।	রুকু থেকে দাঁড়িয়ে বুকের ওপর হাত বাঁধা সুন্নাত।	রুকু থেকে দাঁড়িয়ে বুকে হাত বাঁধা বিদ'আত
তারাবীহের নামাযে রাসূল (সা.) থেকে প্রমাণিত রাকাতের চেয়ে অতিরিক্ত নামায আদায়ের হুকমু।	রাসূল (সা.) থেকে প্রমাণিত রাকাতের চেয়ে অতিরিক্ত নামায আদায় করার ব্যাপারে সুযোগ রয়েছে। কেউ যদি অতিরিক্ত আদায় করে তবে কোনো সমস্যা নেই। তবে উত্তম হলো, অতিরিক্ত না করা।	রাসূল (সা.) থেকে প্রমাণিত রাকাতের চেয়ে অতিরিক্ত নামায আদায় করার ব্যাপারে সুযোগ রয়েছে। কেউ যদি অতিরিক্ত আদায় করে তবে কোনো সমস্যা নেই। তবে উত্তম হলো, অতিরিক্ত না করা।	রাসূল (সা.) থেকে প্রমাণিত রাকাতের (এগার রাকাত) চেয়ে অতিরিক্ত পড়া জায়েয নেই।
কতটুকু পথ অতিক্রম করলে মুসাফির হবে?	অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের অভিমত হলো, সফরের দূরত্বের পরিমাণ হলো, প্রায় আশি কিলোমিটার।	সফরের দূরত্বের জন্য সুনির্দিষ্ট কোনো পরিমাণ নেই। এটি প্রচলিত রীতির ওপর নির্ভর করবে।	সমাজের প্রচলন অনুযায়ী দূরত্ব নির্ধারিত হবে।

আমরা এখানে সামান্য কয়েকটি মাসআলা উল্লেখ করেছি। মূলত লা-মাযহাবী আলেমদের মাঝেও অসংখ্য মাসআলায় মতপার্থক্য বিদ্যমান। সুতরাং শুধু কোরআন ও হাদীস অনুসরণের নাম করলেই যেসব ধরনের মতপার্থক্যের অবসান ঘটবে, এ ধারণা পোষণ করা নিতান্তই অযৌক্তিক। চার ইমামের মতপার্থক্য যদি ইসলামে অনৈক্যের কারণ হয় এবং তাদের কোনো একটি মাযহাবের অনুসরণ যদি কুফুরী, শিরকী হয়, তবে লা-মাযহাবী তিন আলেমের মাঝে যে তিন মাযহাব সৃষ্টি হয়েছে, তাকে কী বলা হবে?

(এ ব্যাপারে দলিলসহ আলোচনা করেছেন, ড.সা'য়াদ বিন আব্দুল্লাহ আল-বারীক।"সম্প্রতি ১৪৩০ হি. মোতাবেক ২০০৯ সালে ড. সাদ ইবনে আব্দুল্লাহ আলবারীকের দুই খণ্ডের একটি কিতাব প্রকাশিত হয়েছে। যার নাম

الايجاز فى بعض ما اختلف فيه الالبانى وابن عثيمين وابن باز

কিতাবটির পৃষ্ঠা ৮শ'র অধিক।

কিতাবটির নাম থেকেই বোঝা যায় যে, এই কিতাবে তিনি এমন কিছু মাসআলা উল্লেখ করেছেন, যেসব মাসআলায় এ যুগের তিনজন সালাফী আলেম: শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায রাহ.(১৩৩০-১৪২০ হি.) শায়খ মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ ইবনে সালেহ ইবনে উছাইমীন রাহ. (১৪২১ হি.) ও শায়খ নাসীরুদ্দিন আলবানী রাহ. (১৩৩২-১৪২০) এর মাঝে মতভেদ হয়েছে।")

সুতরাং শাখাগত বিষয়ে মাযহাবের বিরুদ্ধে প্রচারণা বা বিষোদগার করার পূর্বে অন্তত এতটুকু চিন্তা করা দরকার যে, চার মাযহাবের তুলনায় আমাদের অবস্থান কোথায়? যেই মতভেদের দোষে চার মাযহাবকে দুষ্ট করার চেষ্টা করা হয়, সেই মতভেদ থেকে পৃথিবীর কোনো ফকীহই বেঁচে থাকতে পারবে না। সুতরাং অনৈক্যের কথা বলে চার মাযহাবের মূলোৎপাটনের চেষ্টা করার চেয়ে গঠনমূলক কাজে নিজের মেধাটা ব্যয় করা অধিক কল্যাণকর।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান

কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা বাংলাদেশ

পরিচালনায় : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা, ঢাকা।

প্রসঙ্গ : ব্যাংকে চাকরি

মুহা: রেজাউল করিম
মোমেনশাহী।

জিজ্ঞাসা :

ব্যাংকে চাকরি করা জায়েয হবে কি? যেহেতু ব্যাংকে সুদি লেনদেন হয়।

সমাধান :

সুদি ব্যাংকে চাকরি করলে যেহেতু সুদি কারবারের সহযোগী হতে হয় এবং সুদের আয় থেকে বেতন নিতে হয় তাই সুদি ব্যাংকে চাকরি করা নাজায়েয। (আল বাহরুর রায়িক্ব ৮/৩৫)

প্রসঙ্গ : ইমামত

মুহা: আব্দুর রজ্জাক
মোমেনশাহী

জিজ্ঞাসা :

একজন আলেম যদি নিয়মিত সুন্নাতে মুওয়াক্কাদা তরক করার অভ্যাসে পরিণত করে ফেলেন, তবে তাঁর ব্যাপারে কী হুকুম আর উক্ত আলেমের দ্বারা দ্বীনি কার্যক্রম যথা: নামাযের ইমামতি, ঈদের নামাযের ইমামতি ইত্যাদি করানো যাবে কি না?

সমাধান :

নিয়মিত সুন্নাতে মুওয়াক্কাদা তরককারী ফাসেক বলে গণ্য হবে। এ ধরনের লোকের সর্বপ্রকার নামাযের ইমামতি মাকরুহে তাহরীমী। তবে তার চেয়ে উত্তম কোনো দ্বীনদার ব্যক্তি না থাকলে একা একা নামায না পড়ে তাঁর পেছনে জামাআতের সহিত নামায পড়বে। (রদ্দুল মুহতার ১/৫৪০, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/৫৪)

প্রসঙ্গ : খুতবা

হাফেজ রবিউল ইসলাম
রংপুর।

জিজ্ঞাসা :

খতীব সাহেব ঈদের খুতবা পাঠ করার মাঝে যে তাকবীর বলেন, শ্রোতাদের জন্যও কি সেই তাকবীর পাঠ করা সঙ্গত হবে? কেউ কেউ বলেছেন, ওই সময় খতীবের সাথে সাথে শ্রোতাদের ওই তাকবীর বলতে হবে।

জুমার খুতবায় যদি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নাম পাঠ করা হয় তাহলে ওই সময় কি দরূদ পাঠ করতে হবে? এ ব্যাপারে কেউ কেউ বলেছেন, ওই সময় দরূদ পাঠ করা ওয়াজিব। যেমন অন্য সময় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নাম শুনলেই দরূদ পড়া ওয়াজিব হয়।

সমাধান:

যেহেতু মুসল্লীদের জন্য খুতবা চলাকালীন চুপ থাকা এবং খুতবা শ্রবণ করা ওয়াজিব, তাই খুতবা চলাকালীন খতীব সাহেব তাকবীর বললে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নাম মুবারক উচ্চারণ করলে শ্রোতাগণ মুখে উচ্চারণ করে তাকবীর বলা ও দরূদ শরীফ পড়ার পরিবর্তে দিলে দিলে পড়ে নেবে। (আদ্দুররুল মুখতার ১/১১৩, আল বাহরুর রায়িক্ব ২/২৮৩)

প্রসঙ্গ : মসজিদ

হাজী নুরুল ইসলাম
নওয়াগ্রাম, পাবনা।

জিজ্ঞাসা :

আমাদের মহল্লার মসজিদ ও ঈদগাহ ময়দান সরকার থেকে খাসজমি একশত বছরের লিজ নিয়ে নির্মাণ করা হয়েছে। এমতাবস্থায় কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন যে, ওই মসজিদে ওয়াক্তিয়া নামায হয়ে যাবে; তবে জুমার নামায শুদ্ধ হবে না। ঈদগাহ সম্পর্কে কেউ কিছু বলেননি। এখন প্রশ্ন হলো, সরকারি ভূমি লিজ নিয়ে কি মসজিদ ও ঈদগাহর ময়দান, এমনকি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করা শুদ্ধ হবে?

সমাধান :

সরকারি ভূমি লিজ নিয়ে মসজিদ ও ঈদগাহ ময়দান, এমনকি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করা বৈধ হবে, যদি এগুলো করার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি থাকে। এ ধরনের মসজিদে পাঞ্জেগানা ও জুমার নামাযও শুদ্ধ হয়ে যাবে। (রদ্দুল মুহতার ৪/৩৯০, আযীযুল ফাতাওয়া ১/৫৮১)

প্রসঙ্গ : বিবাহ

মুহা: লাল মিয়া
চড়সামনদেশা, বোশেরহাট,
শরীয়তপুর।

জিজ্ঞাসা :

আমাকে ছোটকালে (১৮-২০ মাস বয়সে) এক-দুবার আমার চাচির দুধ পান করানো হয়। তখন আমার মা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন।

বিষয়টি পরবর্তীতে আমার চাচির স্মরণ না থাকায় তাঁর মেয়েকে আমার কাছে বিবাহ দেন। দীর্ঘ ১০ বছর আমার সংসার চলে আসছে। ইতিমধ্যে আমার একটি সন্তানও হয়েছে, যার বয়স ৯ বছর। এমতাবস্থায় দুধ পানের বিষয়টি চাচির একদিন মনে পড়ে যায় এবং আমাদের সংসার নিয়ে সন্দেহ সৃষ্টি হয় বিধায় এখন কথা হলো আমার চাচির মেয়ে দুধবোনের সাথে আমার সংসার বৈধ কি না? না হলে কী করণীয়? সন্তানের হুকুম কী হবে?

সমাধান :

দুধবোনের সাথে আপনার বিবাহ বৈধ হয়নি বিধায় এই মুহূর্তে পৃথক হয়ে যাওয়া জরুরি। অতীতের ভুলের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের তাওবা করতে হবে। ইদ্দত পালন শেষে আপনার দুধবোনের অন্যত্র বিবাহ হতে পারবে। (সহীহুল বোখারী ২/৭৬৪)। সন্তানটি আপনার বৈধ সন্তান হিসেবে গণ্য হবে। তার সকল দায়দায়িত্ব ভরণ-পোষণ আপনার ওপর বর্তাবে। (রদ্দুল মুহতার ৩/১৩৪)

প্রসঙ্গ : দাড়ি

মাও. আব্দুল কাদির
ভৈরব কমলপুর মাদরাসা, ভৈরব।

জিজ্ঞাসা :

ইসলামী শরীয়তে দাড়ির সীমা কতটুকু? গালের পশম ও নিমদাড়ি কাটার বিধান কী?

সমাধান :

নির্ভরযোগ্য মতানুসারে গাল, থুতনি, চোয়াল এবং চোয়ালের ওপর দিকে কান বরাবর গজানো লোমসমূহ দাড়ির অন্তর্ভুক্ত। চতুর্দিকে এক মুষ্টি পরিমাণ দাড়ি রাখা ওয়াজিব। নিম দাড়ি ও দাড়ির হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। (সহীহুল বুখারী ২/৮৭৫)

প্রসঙ্গ : মীরাস

মুহা: মাছুম বিল্লাহ
আনন্দপুর, কুমিল্লা।

জিজ্ঞাসা :

আমার মা ইন্তেকাল করেছেন। তারপর আমার বাবা বিবাহ করেছেন। বিবাহের চার মাস পর আমার বাবা ইন্তেকাল করেছেন। এখন আমার দ্বিতীয় মা থাকবেন না, চলে যাবেন। আমরা মাকে রাখতে চাই। তিন লক্ষ টাকার মোহরানায় বিবাহ হয়েছিল। আমরা প্রথম মায়ের পাঁচজন সন্তান, দ্বিতীয় মায়ের কোনো সন্তান নেই। এমতাবস্থায় বাবার রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে দ্বিতীয় মা কতটুকু পাবেন?

সমাধান :

আপনার বাবার রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী তথা আপনার সৎমায়ের মোহরানাসহ অন্য কোনো ঋণ থাকলে তা আদায় করার পর অবশিষ্ট সম্পদ থেকে তিনি দুই আনা মীরাস হিসাবে পাবেন। (আদ্দুররুল মুখতার ৮/২৮৩)

প্রসঙ্গ : সুন্নাত, মোবাইল

মুহা: নজরুল ইসলাম
দেওনা, কাপাসিয়া, গাজীপুর।

জিজ্ঞাসা-১

ঘরে প্রবেশের সময় কোন পা আগে রাখা সুন্নাত?

জিজ্ঞাসা-২

মোবাইল ফোনে ডাউনলোডকৃত কোরআনে কারীম দেখে তেলাওয়াত করা এবং তা নিয়ে টয়লেট যাওয়ার শরয়ী বিধান কী এবং এতে কোরআনের আদবের খেলাফ হবে কি না?

সমাধান-১

ঘরে প্রবেশের সময় ডান পা আগে দেওয়া সুন্নাত। কেননা ঘর বাহির থেকে উত্তম। আর প্রত্যেক উত্তম কাজে ও উত্তম স্থানে ডানকে প্রাধান্য দেওয়া সুন্নাত। (সহীহুল বুখারী ১/২৯)

সমাধান-২

যদি গুনাহের বস্তু হতে মোবাইল মুক্ত থাকে এবং কোরআনের মর্যাদা রক্ষা করা সম্ভব হয় তাহলে তাতে কোরআন ডাউনলোড করার অবকাশ আছে। তা দেখে তেলাওয়াত করতেও কোনো আপত্তি নেই। আর ডাউনলোডকৃত কোরআনের আয়াতগুলো যেহেতু ভেতরে, বাহিরে দৃশ্যমান নয়, তাই তা নিয়ে টয়লেটে যাওয়ার অবকাশ আছে। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩২২)

প্রসঙ্গ : ওলিমা

মুহা: আব্দুল্লাহ
হরিরামপুর, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।

জিজ্ঞাসা :

লাগাতার তিন দিনের অধিক সময় বা তিন দিন পর ওলিমার আয়োজন বৈধ কি না? বিবাহের পর দিন একবার করা হলো, অতঃপর সপ্তাহখানেক পর পুনরায় করা হলো। এতে সুন্নাত আদায় হবে কি না? ওলিমার সুন্নাত আদায়ের নির্দিষ্ট কোনো সময় আছে কি না?

সমাধান :

আনন্দ প্রকাশের যে উদ্দেশ্যে শরীয়তে ওলিমার বিধান রাখা হয়েছে, তা বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রীর নির্জনবাস তথা বাসর রাতের পরই পূর্ণাঙ্গরূপে হয়ে থাকে। তাই এ সময়ে ওলিমা করাই আসল সুন্নাত এবং ২-৩ দিনের মধ্যে হওয়া সর্বোত্তম। তিন দিনের ভেতর ওলিমা করতে সক্ষম না হলে অথবা ধারাবাহিক তিন দিন বা এর অধিক সময় ওলিমা খাওয়ানোর প্রয়োজন

হলে লোক দেখানোর অসৎ উদ্দেশ্য না থাকার শর্তে জায়েয। অনুরূপভাবে বিয়ের পর বাসর রাতের আগে ওলিমা করলে তা যথাসময়ে না হলেও ওলিমা আদায় হয়ে যাবে। তবে বিয়ের পূর্বে ওলিমা আদায়ের কোনো সুযোগ নেই। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ৯/৩৪০)

প্রসঙ্গ : পর্দা, সুন্নাত

মাও. হাফেজ আব্দুল বাসেত
চরমটুয়া ইসলামিয়া মাদরাসা, নোয়াখালী।

জিজ্ঞাসা-১

নিজের ঘরের কাজ করার জন্য মাসিক বা বাৎসরিক যে কাজের মেয়ে রাখা হয়, এই কাজের মেয়ের সাথে তার মালিকের পর্দার বিধান কী?

জিজ্ঞাসা-২

সাধারণ পানি, অর্থাৎ যমযম বা ওযুর পানি ব্যতীত অন্য পানি দাঁড়িয়ে পান করার হুকুম কী?

সমাধান-১

নিজের ঘরের কাজে নিয়োজিত বেগানা প্রাপ্তবয়স্ক গৃহপরিচারিকার সাথেও পর্দা করা ফরয। (সূরা নূর-৩০)

সমাধান-২

ফিকহশাস্ত্রবিদদের নির্ভরযোগ্য মত অনুযায়ী যমযম ও ওযুর অবশিষ্ট পানি ব্যতীত অন্যান্য সাধারণ পানি কোনো ওজর ব্যতীত দাঁড়িয়ে পান করা মাকরুহে তানযীহী, তথা-অনুচিত। (সহীহ মুসলিম ২/১৭৩)

প্রসঙ্গ : কুরবানী

মুহা: আরিফুল ইসলাম
বালুচর, চাটমোহর, পাবনা।

জিজ্ঞাসা :

আমাদের সমাজে এক ধরনের নিয়ম চালু আছে, যে ব্যক্তি পশু কোরবানী করেন তিনি তাঁর কোরবানীর পশুর গোস্তের তিন ভাগের এক ভাগ সমাজে জমা দেন এবং পরবর্তীতে বণ্টনের সময় তাঁকে ওই গোস্ত দেওয়া হয় না। বরং তার উল্টাটা দেওয়া হয়। অর্থাৎ গরুর ক্ষেত্রে খাসি দেওয়া হয় আর খাসির ক্ষেত্রে গরু। উল্লিখিত নিয়মে যদি সমাজ থেকে গোস্ত নেওয়া এবং দেওয়া হয় তাহলে এ নিয়মটা কি জায়েয হবে? এবং গরিব-মিসকিনদের হক নষ্ট হবে কি না?

সমাধান:

কুরবানীর গোস্তের ব্যাপারে শরীয়ত কুরবানী দাতাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে। সে চাইলে পুরোটা নিজের জন্য রেখে দিতে পারে বা কাউকে দিতেও পারে। তিন ভাগ করার বিষয়টা সম্পূর্ণ তার ইচ্ছাধীন এবং উত্তম। শরীয়তে যে বিষয়ে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই সামাজিকভাবে তাতে মনগড়া কোনো নিয়ম চালু করা ভিত্তিহীন। এতে অনেক সময় শরীয়তের সীমা লংঘিত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকে বিধায় প্রশ্নে উল্লিখিত সামাজিক প্রথাসমূহ বর্জনীয়। প্রত্যেকে খুশিমনে নিজের সাধ্যানুযায়ী নিজের আত্মীয়দেরও গরিবদের থেকে যাকে যতটুকু ইচ্ছে বিলি-বণ্টন করাই শরীয়তের বিধান। (সূরা হজ ৩২, মুসনাদে আহমদ ৫/৭২)

প্রসঙ্গ : চুক্তি

শফিকুল ইসলাম
নান্দাইল, মোমেনশাহী।

জিজ্ঞাসা : একজন রাজমিস্ত্রী নিজ এলাকা থেকে দূরে কোথাও গিয়ে রাজের কাজ করে এবং সাথে সহযোগী যোগাল নিয়ে যায়। যেই স্থানে যায় সেই স্থানের মালিক তাকে বলে আমি তোমাকে প্রতিদিন ৫০০ টাকা ও প্রতি শ্রমিককে ৪০০ টাকা করে দিবে। সেই মিস্ত্রী বাড়ি থেকে দুই জন শ্রমিক নিয়ে যায়, এই বলে যে, সে তাদেরকে ৩০০ টাকা করে দিবে।

এখন আমার জানার বিষয় হলো সেই মিস্ত্রী কি অতিরিক্ত ১০০ টাকা গ্রহণ করতে পারবে কি না? আর মালিক যদি ১০০ টাকা রেখে দেওয়ার বিষয়টি জানে তাহলে তার বিধান কি? আর যদি না জানে তাহলে তার বিধান কি? অনুরূপভাবে বিষয়টি শ্রমিককে জানানো না জানানোর বিধান কি? আর যদি মালিক ৩০০ টাকা থেকে কম দেয় এক্ষেত্রে মিস্ত্রীর করণীয় কি?

সমাধান :

উক্ত রাজ মিস্ত্রী তার দুইজন শ্রমিকের সাথে যদি এই মর্মে চুক্তি করে যে, আমি তোমাদেরকে দৈনিক ৩০০টাকা পারিশ্রমিক দিব, আর মূল মালিকের কাছ থেকে কম বেশি নিলে তাতে তোমার কোনো আপত্তি থাকবে না। তাহলে উক্ত মিস্ত্রীর জন্য অতিরিক্ত ১০০টাকা গ্রহণ করা বৈধ হবে। কিন্তু যদি সে শ্রমিকের সাথে চুক্তি করা ব্যতীত বাহানার মাধ্যমে তার শ্রমিককে এ কথা বোঝায় যে আমি মূল মালিকের কাছ থেকে ৩০০ টাকাই এনে তোমাদেরকে দেই, তাহলে তার জন্য অতিরিক্ত টাকা নেয়া জায়েয হবে না। তাই প্রশ্নে বর্ণিত অতিরিক্ত টাকা চুক্তিভিত্তিক হওয়ার কারণে হালাল হবে। মূল মালিক যদি টাকা কম দেয়, তখন শ্রমিকের কাছে আরযী পেশ করতে পারে। (রাদ্দুল মুহতার ২/৪৭, খুলাসাতুল ফতাওয়া ৩/১১৬)

মলফূজাতে আকাবের

আবু নাঈম মুফতী মুঈনুদ্দীন

সময়ের মূল্যায়নঃ

আরেফ বিল্লাহ হযরত মাওলানা ডা. আব্দুল হাই (রহ.) হায়াতের শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে সর্বশেষ বৈঠকে বলেছেন, আমার পূর্ণজীবনের অভিজ্ঞতা এবং এ বয়সে পৌঁছে বলছি, জেনে রেখো! বুঝে নাও, এটিই শরীয়ত ও তরীকতের খোলাসা। তা হলো, "সময়" যে সময়কে মূল্যায়ন করেছে সে সবকিছু হাসেল করতে পেরেছে। এবং যার উপর আল্লাহ পাকের বিশেষ অনুগ্রহ হয়, তাকেই সময়ের মূল্যায়নের তাওফিক দান করা হয়। (কালিমাতে সিদক্ব ওয়া আদল -৭৬)

প্রবৃত্তির আনুগত্য :

তাবলীগ জামাআতের সাবেক আমীর মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব (রহ.) বলেন, আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি ব্যতীত অন্য যে কোনো নিয়তে কাজ করাই প্রবৃত্তির আনুগত্য। ধন-সম্পদ মিলবে, বাড়বে, মানুষ প্রশাংসা করবে। আমি বড় হবো, প্রসিদ্ধি লাভ করবো, ক্ষমতা মিলবে, সবার প্রত্যাবর্তন স্থল হবো, একমাত্র আমার কথাই চলবে। আমার পদমর্যাদা মান্য করা হবে। আমার মতামত জিজ্ঞাসা করা হবে। এসব উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কাজ করা কখনই ইসলাম ও লিল্লাহিয়্যাত হতে পারে না। (আকাবির ওলামায়ে দেওবন্দ)

অস্থিরতার মূল কারণ :

হযরত মাওলানা মুফতী শফী (রহ.) বলেন, গুনাহই অস্থিরতার মূল কারণ। গুনাহ অর্থ আল্লাহ পাকের হুকুমের অমান্যতা। তার প্রতিকার হলো, গুনাহ ছেড়ে আল্লাহ পাকের রেজামন্দী হাসিলের চেষ্টায় থাকা। (মাজালেসে মুফতীয়ে আজম-৩০৪)

অন্তর নষ্ট হয়ে যাওয়ার আলামত :

হযরত মাওলানা মুফতী শফী (রহ.) বলেন, অন্তর নষ্ট হয়ে যাওয়ার আলামতসমূহ এই- (১) ওয়াজ করে অন্তর প্রফুল্ল হওয়া। (২) গায়রুল্লাহর সাথে সম্পর্কের মধ্যে অন্তর লেগে যাওয়া। (৩) অন্তর একাগ্রতা থেকে অন্ধ হওয়া। (৪) নামাযে মজা না লাগা। (৫) ওয়াজ যতই করুক তাতে মজা অনুভূত হওয়া। (৬) কোনো মাহফিলে বক্তৃতা দেওয়ার কথা বলা হলে সাথে সাথেই মাহফিলে উপস্থিত হওয়ার জন্য তৈরি হওয়া। (প্রাগুক্ত)

বাস্তব পূর্ণতা কী?

হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) বলেন, মানুষ বিশেষ বিশেষ জিনিসকে পূর্ণতা মনে করে। কেউ ইবাদতকে, কেউ তাক্বওয়াকে। কিন্তু জ্ঞানী লোকেরা সবচাইতে বড় পূর্ণতা মনে করেন, "বান্দা নিজ দোষত্রুটি সামনে রাখাকে"। (আল ইফাযাতুল ইয়াউমিয়্যাহ-৩২২)

তালেবে ইলমদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ আদব :

আরেফ বিল্লাহ মাওলানা কারী সিদ্দীক আহমদ বান্দভী (রহ.) বলেন, তালেবে ইলমদের গুরুত্বপূর্ণ আদব নিম্নরূপ:

(১) নিয়তকে পরিশুদ্ধ ও দৃঢ় করা। (২) গুনাহ এবং কূঅভ্যাস পরিহার করা। (৩) শিক্ষক মহোদয়গণের সম্মান বজায় রাখা। (৪) সহপাঠিদের সাথে সহানুভূতি করা। (৫) ইলম অর্জনে কঠোর পরিশ্রম করা। (৬) ইলমের প্রতি অনুরাগী হওয়া এবং এর জন্য প্রয়োজনে সফর করা। (৭) দ্বীনি কিতাবাদীর সম্মান বজায় রাখা। (৮) ইলম অর্জনে দৃঢ়তা অবলম্বন করা এবং সকল প্রকারের কষ্ট সহ্য করা। (৯) উস্তাদগণের খেদমত করা। (১০) কোন কামেল শায়খের সাথে ইসলাহী সম্পর্ক কায়েম করা।

দ্বীনি মাদরাসাসমূহ তাবলীগের কেন্দ্র :

কুতুবে যমান হযরত মাওলানা সুলতান আহমদ নানূপুরী (রহ.) বলেন, আলহামদুলিল্লাহ! তাবলীগ জামাআতের মাধ্যমে দ্বীনের বড় কাজ সম্পাদিত হচ্ছে। তাই প্রত্যেকেরই একাজের সাথে জড়িত থাকা উচিত। উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহর বান্দা হওয়া। (মনে রাখা দরকার) দ্বীনি মাদরাসাসমূহ তাবলীগের মারকায বা কেন্দ্র, কারখানা ও ফ্যাক্টরী। তা হতে মুবাল্লিগ বের হয়। মুয়াজ্জিন এক প্রকারের মুবাল্লিগ, ইমাম আরেক প্রকারের মুবাল্লিগ, ওয়ায়েজ, পীর মাশায়েখ, কিতাব রচনা, প্রকাশনা এবং প্রচলিত বিশেষ নিয়মে তাবলীগ ইত্যাদি মাদরাসারই ফসল। তাই একে অপরকে খারাপ মনে করা নিজেই খারাপ হওয়ার প্রমাণ। (মা'আরিফে সুলতান ১১/৪২)

ছাহেবে নিসবত কাকে বলে?

মাওলানা মুফতী রশীদ আহমদ লুধিয়ানভী (রহ.) বলেন, আল্লাহ পাকের সাথে মাখলুকের অগণিত নিসবত বা সম্পর্ক রয়েছে। যেমন, তিনি খালেক আমরা মাখলুক। তিনি রিযিকদাতা আমরা রিযিকপ্রাপ্ত ইত্যাদি। এসব নিসবতকে ধ্যান করে এবং শরীয়তের আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহ পাকের সাথে মানুষের এক বিশেষ সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। সূফিদের পরিভাষায় তাকে নিসবত বলা হয়।

হযরত থানভী (রহ.) বলেন, যার মধ্যে দুটি গুণ বিদ্যমান থাকে, তাকে "ছাহেবে নিসবত" বলা হয়। (১) دوام طاعت তথা- সর্বদা আল্লাহর নাফরমানী থেকে মুক্ত থাকা। (২) كثرت ذكر তথা- অধিক হারে আল্লাহর যিকির করা। (আহসানুল ফাতাওয়া ১/৫৫০)

AL MARWAH OVERSEAS
recruting agent licence no-rl156

ROYAL AIR SERVICE SYSTEM
hajj, umrah, IATA approved travel agent

হজ, ওমরাসহ বিশ্বের সকল দেশের ভিসা প্রসেসিং ও সকল এয়ারলাইন্স টিকেটিং অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে অল্পখরচে দ্রুত সম্পন্ন করা হয়।

Shama Complex (6th Floor)
66/A Naya Paltan, V.I.P Road
(Opposite of Paltan Thana East Side of City Haeart Market)
Dhaka: 1000, Bangladesh.
Phone: 9361777, 9333654, 8350814
Fax 88-02-9338465
Cell: 01711-520547
E-mail: rass@dhaka.net

আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে সর্বপ্রকার বাতিলের মোকাবেলায় এগিয়ে যাবে
“আল-আবরার” এই কামনায়

জনপ্রিয় ১৯৩৭ সাবান

প্রস্তুতকারক

হাজী নুরআলী সওদাগর এন্ড সন্স লিঃ

চাক্তাই, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

ফোন : বিক্রয় কেন্দ্র : -০৩১-৬৩৪৯০৫, অফিস: ০৩১-৬৩২৪৯৩, ৬৩৪৭৮৩

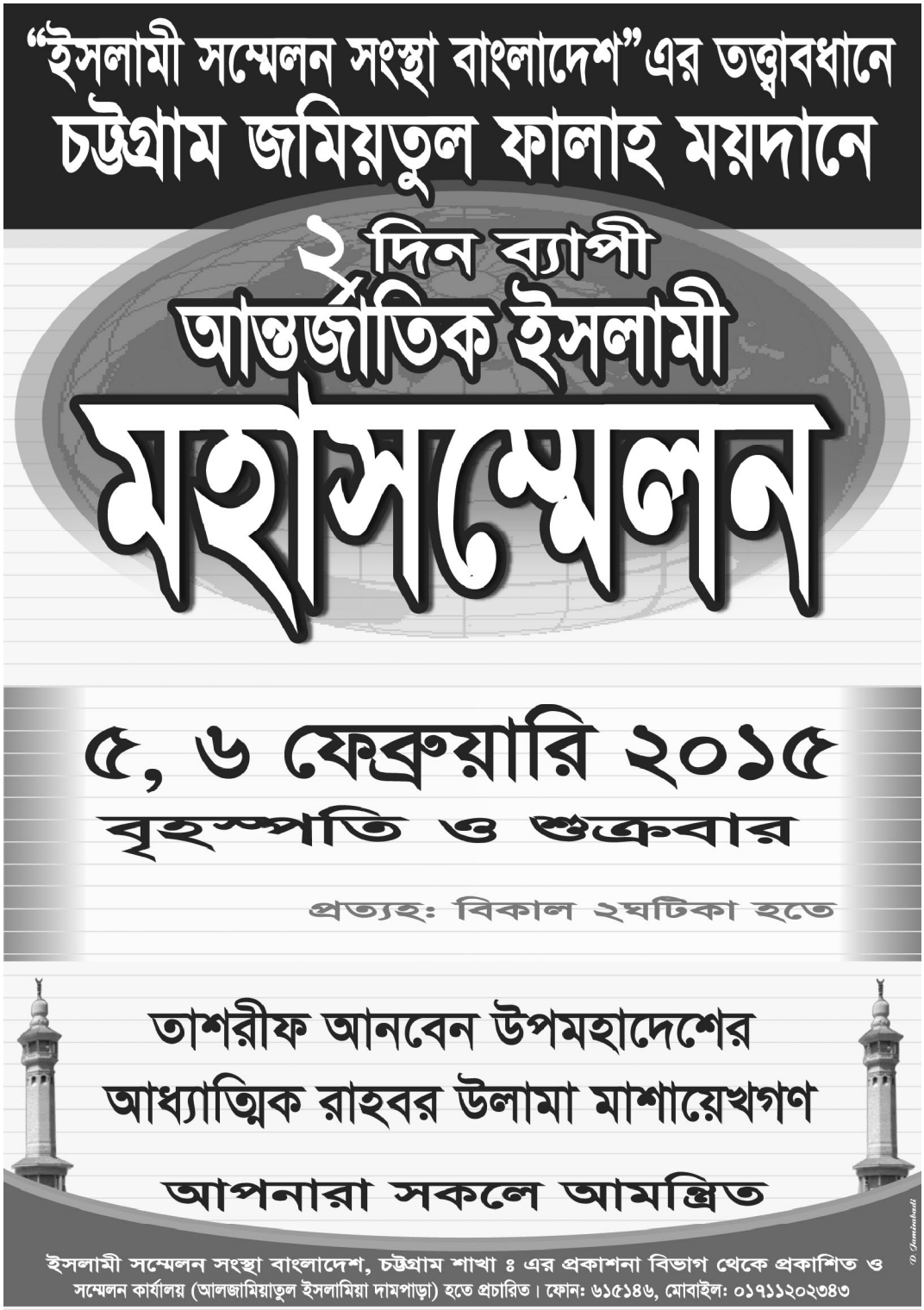

"ইসলামী সম্মেলন সংস্থা বাংলাদেশ"এর তত্ত্বাবধানে
চট্টগ্রাম জমিয়তুল ফালাহ ময়দানে
২ দিন ব্যাপী
আন্তর্জাতিক ইসলামী
মহাসম্মেলন
৫, ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৫
বৃহস্পতি ও শুক্রবার
প্রত্যহ: বিকাল ২ঘটিকা হতে
তাশরীফ আনবেন উপমহাদেশের
আধ্যাত্মিক রাহবর উলামা মাশায়েখগণ
আপনারা সকলে আমন্ত্রিত
ইসলামী সম্মেলন সংস্থা বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম শাখা ঃ এর প্রকাশনা বিভাগ থেকে প্রকাশিত ও
সম্মেলন কার্যালয় (আলজামিয়াতুল ইসলামিয়া দামপাড়া) হতে প্রচারিত। ফোন: ৬১৫১৪৬, মোবাইল: ০১৭১১২০২৩৪৩
D. Jamirabadi